Through Knowledge towards Jannah

**Islamic Online Madrasah – IOM**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

# ইসলামে হালাল ও হারাম


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাবরিনা সুলতানা রুমা

রোলঃ ২৩০৯০১২১৫৫৫


২০ই নভেম্বর ,২০২৫ইং

Through Knowledge towards Jannah

**Islamic Online Madrasah – IOM**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ
রিসার্চের বিষয়ঃ
# ইসলামে হালাল-হারাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

Through Knowledge towards Jannah


তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও. আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ
সাবরিনা সুলতানা রুমা
রোলঃ ২৩০৯০১২১৫৫৫


২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

**Islamic Online Madrasah – IOM**

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

## প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "ইসলামে হালাল হারাম" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাবরিনা সুলতানা রুমা, আইডিঃ ২৩০৯০১২১৫৫৫ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

**(স্বাক্ষর)**

**তত্ত্বাবধায়নেঃ-**

**মাওলানা আরমান হোসাইন**

**রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট**

**ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা– আইওএম**

**(স্বাক্ষর)**

**এক্সটার্নালঃ**

**মাওলানা মাহবুবুর রহমান**

**রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট**

**ইসলামিক অনলাইন মাদরাসা – আইওএম**

## ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামে হালাল ও হারাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং যেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাবরিনা সুলতানা রুমা

(স্বাক্ষর)

সাবরিনা সুলতানা রুমা

আইডিঃ ২৩০৯০১২১৫৫৫

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

# সূচিপত্র


সারসংক্ষেপ ..... 5

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা ..... 5

হালাল হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি ..... 6

মুসলমানের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবনে হালাল হারাম ..... 12

- পানাহারে হালাল- হারাম ..... 12
- নেশাদায়ক সবকিছুই হারাম ..... 19

পোশাক পরিচ্ছদ ..... 21

অতিরিক্ত সৌন্দর্য অবলম্বনে আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতিকরণ ..... 24

- দেহে চিত্র অংকন(ট্যাটু করা), দাঁত শানিতকরণ ও সৌন্দর্যের জন্য কাটছাট করা. 24
- ইসলামে দাঁতের ফাঁক করা (অর্থাৎ) কৃত্রিমভাবে দাঁতের মাঝে ফারাক সৃষ্টি করা:- 24
- ভ্রু সরুকরণ:- ..... 25
- পরচুলা লাগানো:- ..... 25
- খেজাব লাগানো:- ..... 25
- দাঁড়ি ছাটা :- ..... 26

ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি ..... 27

- মহাপুরুষদের স্মৃতি রক্ষায় প্রতিকৃতি:- ..... 27
- শিশুদের খেলাধুলায় অনুমতি :- ..... 28
- অসম্পূর্ণ বিকৃত প্রতিকৃতি:- ..... 28
- দেহহীন অংকন:- ..... 28
- ফটোগ্রাফির ছবি:- ..... 29

বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন ..... 30

কর্মে সক্ষম ব্যক্তি নিষ্কর্মা বসে থাকা হারাম ..... 31

- হারাম চাষাবাদ:- ..... 31
- দেহ ব্যবসা/যৌন পেশা:- ..... 31
- নৃত্য ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি :- ..... 31

ব্যবসা করে উপার্জন ..... 32

- হারাম ব্যবসা:- ..... 32
- চাকরির ক্ষেত্রে হারাম :- ..... 34

পুরুষ ও নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বৈধ সীমা ..... 35

- যিনাকে হারাম করা হয়েছে:- 36
- সাধারণ গোসলখানায় নারীর প্রবেশ:- 37

বিবাহে হালাল-হারাম 37

- যে সকল নারীকে বিয়ে করা হারাম :- 37
- আহলে কিতাবীদের বিয়ে করা:- 38
- বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কিত হারাম:- 38
- কুমারী মেয়ের অনুমতি ও তাকে জোর না করা:- 39
- সাময়িক বিয়ে করা হারাম:- 39
- একাধিক স্ত্রী গ্রহণের শর্ত:- 40
- স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে হালাল-হারাম:- 41

তালাক 43

পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক 47

মীরাস বন্টনে আল্লাহর বিধান 51

বিশ্বাস ও অনুসরণ 53

ইসলামে স্বজনপ্রীতির ধারণা 56

বীমা কোম্পানী 58

জমি চাষাবাদে হালাল-হারাম 59

পশুপালনে শরীকানা 60

অবসর সময়ে খেলাধুলা ও বিনোদন 62

মুসলমানদের সামাজিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত 65

ইসলামে রক্তের মর্যাদা 70

আত্মহত্যা 72

ধন সম্পদের মর্যাদা 74

- ব্যক্তিগত সম্পদের অপব্যবহার:- 74
- ঘুষ হারাম :- 74

সূত্রঃ 75

# সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন ও বাস্তব জীবনে ইসলামে হালাল ও হারাম সম্পর্কে জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো- কুরআন, হাদীস ও ইসলামী ফিকহ অনুযায়ী হালাল ও হারাম কিভাবে মুসলমানদের দৈনন্দিন ও প্রাত্যহিক জীবনে দিকনির্দেশনা দেয় এবং সে অনুসারে একজন মুসলমানের জীবন গড়ে তোলা যেনো সে তার ব্যক্তিগত,সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবনে হালাল ও হারাম মেনে চলতে পারে, এমনভাবে অভ্যস্ত হতে পারে যেনো সে দুনিয়াও আখিরাতে সফল হতে পারে।

এই গবেষণায় গুণগত বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।যেখানে প্রাথমিক উৎস হিসেবে কুরআন, সহীহ হাদিস ও হানাফী মাজহাবের মতামত আলোচনা করা হয়েছে। এই আধুনিক যুগে একজন মুসলমান কোন বিষয়ে ছাড় দেয়া উচিত এবং কোন বিষয়ে একদম ছাড় দেয়া উচিত নয় এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

এই গবেষণা শেষে আমরা বুঝতে পারবো, হালাল হারাম কেবল খাদ্য, ইবাদাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং ইসলাম এমন এক সর্বোত্তম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা প্রতিটি ক্ষেত্রে খাদ্য থেকে শুরু করে অর্থনীতিতে, আমাদের বাণিজ্যে, শিল্পে, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, আমাদের মননে- অবশ্যম্ভাবী প্রভাব ফেলে।

# গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

**হালাল:**- এমন বৈধ কাজ, যাতে কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়নি।

**হারাম**:- যা কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে শরিয়তে এবং তা অমান্য করলে গুণাহ হবে এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে পারে।

**মাকরুহ (ঘৃণ্য):**-এমন কাজ যা শরিয়াতে নিরুৎসাহিত বা পরিহারযোগ্য ,তবে তা হারাম নয়। এ কাজগুলি না করা উত্তম, কিন্তু তা করার জন্য শাস্তি বা গুণাহ হবে না।তবে অতিরিক্ত মাকরুহে জড়ালে এবং একে হালকাভাবে নেওয়ার প্রবণতা ধীরে ধীরে হারাম কাজের দিকে ধাবিত করে।

# হালাল হারামের ক্ষেত্রে ইসলামের মূলনীতি

আইয়্যামে জাহেলিয়াত থেকে শুরু করে ইসলাম আগমনের পর পর্যন্ত মানুষের চিন্তা ও কর্মে বহু বিভ্রান্তি ও অস্পষ্টতা লক্ষ্য করা গেছে। এর মধ্যে হালাল ও হারাম অন্যতম। ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ অনেক বিষয়কে মানুষ হালাল মনে করেছে, আবার উপকারী ও বৈধ বিষয়কে করেছে হারাম। এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য ইসলাম কিছু মৌলিক নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করেছে, যার মাধ্যমে হালাল ও হারামের সঠিক ধারণা, বিচার ও বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- **বস্তুর মূল হলো বৈধ হওয়া এবং বিধান প্রণয়নকারী একমাত্র আল্লাহ।**

আল্লাহ তাআলার সকল সৃষ্টি বৈধ যতক্ষণ  না হারাম হওয়ার দলিল পাওয়া যায়।এজন্য ইসলামি শরিয়তে হারামের গন্ডি খুবই সীমিত, অথচ হালালের পরিসীমা বিস্তৃত। হারামের বিধান সংক্রান্ত বিশুদ্ধ ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য খুবই কম। যেসব ক্ষেত্রে হালাল বা হারামের ব্যাপারে কোনো বক্তব্য নেই, সেগুলো বৈধ।এ সম্পর্কে আবু দারদা (রা:) থেকে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে,  রাসুলুল্লাহ (সাঃ)  বলেছেন, “হালাল স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। তবে এ দুয়ের মাঝে এমন কিছু সন্দেহজনক বিষয় রয়েছে, যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি এসব সন্দেহজনক বিষয় থেকে বেঁচে থাকে, সে তার ধর্ম ও মর্যাদা রক্ষা করে।”-(বাইহাকি:১৯৭২৪)। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন:-

“আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন, তা হালাল; যা হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যেসব বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন, সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। অতএব, তোমরা আল্লাহর এই ক্ষমা গ্রহণ করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো কিছু ভুলে যান না।”

এরপর তিনি তেলাওয়াত করেন,

“আর তোমার প্রতিপালক বিস্মৃত নন।”

(সূরা মরিয়াম ১৯:৬৪)

সালমান ফারসী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন –“যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে হালাল ঘোষণা করেছেন, তা হালাল; আর যা তিনি হারাম করেছেন, তা হারাম। আর যেসব বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন, সেগুলো এমন বিষয় যেগুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন (অর্থাৎ তা বৈধ)।”

হারাম বিষয়াদি সম্পর্কে জানাই যথেষ্ট। কেননা,  এরপরে যে বিষয়ে হারামের প্রমান পাওয়া যাবে না,  সেগুলো হালাল হিসেবে বিবেচিত।রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা কিছু সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন,  অতএব তোমরা সেগুলো অতিক্রম করো না। তিনি তোমাদের জন্য কিছু ফরজ নির্ধারণ করেছেন। তাই তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না।তিনি কিছু বিষয় হারাম করেছেন  সুতরাং  তোমরা তা লঙ্ঘন করো না।আর কিছু বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন। তা তোমাদের জন্য রহমত স্বরূপ, বিস্মৃতি নয়। অতএব, তোমরা সেসব বিষয়ে (অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত) অনুসন্ধান করো না।”

-(মুসতাদরাকুল হাকিম:৭১১৪)

সবকিছুর মূল হলো বৈধতা- এই মূলনীতি শুধু বস্তু ও সামগ্রীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং অন্যান্য যাবতীয় কর্মকাণ্ড ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর তিনি তোমাদের জন্য ওইসব বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন, যেগুলো তোমাদের ওপর হারাম করেছেন।"-( সূরা আনআম,আয়াত:১১৯)

তবে ইবাদাতের বিষয়টি স্বতন্ত্র। ওহির নির্দেশনা ছাড়া কিছুই ইবাদাত হিসেবে গ্রহনযোগ্য নয়। আয়িশা (রা:) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, "দ্বীনের অংশ নয় এমন কোনো কিছু আমাদের দ্বীনের মধ্যে কেউ উদ্ভাবন ঘটালে তা হবে প্রত্যাখ্যাত।"

( সহীহ বুখারি:২৬৯৭, সহীহ মুসলিম :১৭১৮)

এখানে যেসব বিধি নিষেধ কুরআনে নেই, বরং রাসুলুল্লাহ (সা:) এর হাদিস থেকে প্রমাণিত, সেগুলো ও আল্লাহ তাআলা কর্তৃকই অনুমোদিত। কেননা,রাসুলুল্লাহ (সা:) শরিয়ত বিষয়ক কোনো কথা বা কাজ আল্লাহ তাআলার অনুমতি ছাড়া করেন না। এ বিষয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। সেটা তার কথাবার্তা তো কেবলই ওহি, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়।"- (সূরা নাজম, আয়াত: ৩-৪)

মূলকথা, দৈনন্দিন লেনদেন ও সাধারণ কাজকর্ম স্বাভাবিকভাবেই বৈধ।তাই কোনো লেনদেন হারাম বলতে হলে সেখানে হারাম হওয়ার প্রমাণ লাগবে। কেননা আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,-

"বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে রিযিক অবতীর্ণ করেছেন, তারপর তোমরা তার কিছুকে বানিয়েছো হারাম আর কিছুকে বানিয়েছো হালাল।-(সূরা ইউনুস,আয়াত:৫৯)

এর ভিত্তিতে বলা যায়, খাওয়া-দাওয়া, কেনা বেচা ইত্যাদি মানুষের স্বাভাবিক প্রয়োজনে আমরা যেসব লেনদেন করে থাকি, তার প্রায় সবই শরিয়তে বৈধ। কিন্তু এর ভেতর ক্ষতিকর ও অনিষ্টকর লেনদেনগুলো (যেমন: সুদ) আবার শরিয়তে হারাম। অনুচিত বিষয়াবলি হয়েছে মাকরুহ। যার মধ্যে কোনো ভালো দিক রয়েছে, তাকে মুস্তাহাব বা পছন্দনীয় বলা হয়েছে।এই হালাল- হারাম, মাকরূহ, মুস্তাহাবের বিধানগুলো সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। যতক্ষণ শরীয়ত কোনো সীমা নির্ধারণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা বৈধ।

যেমন জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,"আমরা আযল করতাম আর তখন কুরআন নাযিল হতো। এতে যদি নিষেধ করার মতো কিছু থাকত, তবে কুরআন আমাদেরকে তা থেকে নিষেধ করে দিত।"-(সহীহ মুসলিম :১৪৪০)

অর্থাৎ ওহী যে ব্যাপারে চুপ থাকে, সে ব্যাপারটি হারাম বা নিষিদ্ধ হয় না। যতক্ষণ নিষিদ্ধতা ও বারণবিষয়ক স্পষ্ট কোনো বক্তব্য না আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত এমন কাজে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা সবার জন্য রয়েছে।

## • হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল মনে করা শিরক।

হালালকে হারামকারী আর হারামকে হালালকারী দুই দলের কর্মকান্ডেরই নিন্দা করা হয়েছে কুরআনে। তবে তুলনামূলক অধিকতর কঠোর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে হালালকে হারামকারী নিন্দার ক্ষেত্রে।দ্বীনের মধ্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর অপছন্দ ছিল।তিনি বলেন -

" শুনে রাখো, অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। অতিরিক্ত বাড়াবাড়িকারীরা ধ্বংস হয়ে গেছে। "- (সহীহ মুসলিম :২৬৭০, সুনানে আবু দাউদ :৪৬০৮)

ইসলাম শান্তির ধর্ম।এই দ্বীন আকিদা, ঈমান, তাওহীদের ব্যাপারে সুদৃঢ় এবং আমল ও শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে উদার ও সহজ। কেননা হাদীসে আছে - "নিশ্চয়ই দ্বীন (ইসলাম) সহজ। কেউ যদি দ্বীনের ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠোরতা করে, তাহলে দ্বীন তার উপর প্রাধান্য পাবে (সে টিকতে পারবে না)। তাই তোমরা সঠিক পথ অবলম্বন করো, নিকটবর্তী হও, এবং সুখবর গ্রহণ করো।"-(সহীহ বুখারী:৩৯)

আল্লাহ তাআলার সাথে শিরক ও হালালকে হারামকরণ এই দ্বীনের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক। হাদিসে কুদসীতে আল্লাহ তাআলা এই দুটি জিনিসকে একসাথে উল্লেখ করেছেন, " আমি আমার সকল বান্দাদেরকে একনিষ্ঠ (মুসলিম) হিসেবে সৃষ্টি করেছি। তারপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়। আমি যে সমস্ত জিনিস তাদের জন্য হালাল করেছিলাম সে তা হারাম করে দেয়। শুধু তাই নয়, সে তাদেরকে আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার জন্য নির্দেশ প্রদান করে, সে বিষয়ে আমি কোনো প্রমাণ পাঠাইনি।"-(সহীহ মুসলিম :২৮৬৫) হালালকে হারাম বলা শিরকের মতো জঘন্য কাজ। মাদানি জীবনে এসে আমরা দেখি, কিছু মুমিন কঠোরতা, বৈরাগ্য ও বৈধ জিনিসের মধ্যে সীমাবদ্ধতার দিকে ঝুঁকতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তাআলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কিছু আয়াত অবতীর্ণ করলেন। ফলেতারা আল্লাহ তাআলার নির্দেশিত পথে ফিরে এসেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে মুমিনগণ, আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেগুলোকে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙঘনকারীদের পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা থেকে খাও এবং আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো, যার প্রতি তোমরা বিশ্বাসী।"-(সূরা মায়িদা,আয়াত:৮৭-৮৮)

## • নিষিদ্ধতার কারণ নিকৃষ্টতা ও ক্ষতি।

কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, ইসলামে হালাল কি?উত্তর হলো- উত্তম বস্তুসমূহ।কোনো অভ্যাস বা রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া ছাড়া সবার কাছে যা ভালো লাগে এবং একজন সুস্থ বিবেকবান মানুষের কাছে যা উত্তম মনে হয় তাই হালাল।আল্লাহ তাআলা বলেন, "আজ তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করা হলো।"-(সূরা মায়িদা, আয়াত:৫)

আল্লাহ তাআলা মানুষের কল্যাণ বিবেচনায় কিছু জিনিসকে হারাম করেছেন এবং তা হারাম করার পেছনে যুক্তিসংগত কারণ ও রেখেছেন, মানুষের কল্যাণের বিষয় বিবেচনায়

নিয়েছেন, ফলে তিনি উপকারী ও কল্যাণকর ছাড়া কিছুই হালাল করেননি এবং ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক উপাদান ছাড়া কিছুই হারাম করেননি। হারামের পেছনে কারণ হলো অনিষ্টতা ও ক্ষতি। যে বস্তু নিরেট ক্ষতিকর, তা স্রেফ হারাম। বিভিন্ন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞার কারণ একসময় অস্পষ্ট থাকলেও পরবর্তী সময়ে এসে তা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। যেমন: শূকরের মাংস। আধুনিক সময়ে বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, শূকরের মধ্যে মারাত্মক ক্ষতিকর পরজীবি থাকে যার নাম Taenia solium, যা মানবদেহে neurocysticercosis নামে ভয়ংকর রোগ উৎপন্ন করে, যা মানুষের মস্তিষ্কে আঘাত হানে। যদি বিজ্ঞান এসব জিনিস আবিষ্কার নাও করত, সর্বাবস্থায় একজন প্রকৃত মুমিন তার বিশ্বাসে অটল থাকত যে, শূকর একটি অপবিত্র ও হারাম প্রাণী। মুমিনের কর্তব্য হলো- সে সবসময় বলবে, "আমরা শুনলাম ও মানলাম।"কারণ এই বিধানগুলো সবই মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"আল্লাহ জানেন, কে উপকারী এবং কে অনিষ্টকারী। আর আল্লাহ ইচ্ছে করলে তোমাদেরকে অবশ্যই কষ্টে ফেলতে পারতেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রবল পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।"-(সূরা বাকারা, আয়াত:২২০)

## • হারাম থেকে বাচাঁর জন্য বিকল্প আছে হালালে।

আমরা যদি ইসলামের বিধানগুলো দেখি,তাহলে দেখতে পাব আল্লাহ তাআলা বান্দাদের জন্য কোনো কিছুই সংকীর্ণ করেননি।ইসলাম যদি কোনো কিছু হারাম করে থাকে তবে তার বিপরীত উত্তম কোনো কিছুকে হালাল করেছে যাতে মানবজাতি তাদের প্রয়োজন পবিত্র ও বৈধ পন্থায় মেটাতে পারে এবং হারামের মুখাপেক্ষী হতে না হয়।উদাহরণস্বরূপ:- ইসলাম সুদ হারাম করেছে, এর বিপরীতে ব্যবসাকে করেছে হালাল।ব্যভিচারকে করেছে হারাম, বিয়েকে করেছে হালাল। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর বান্দার জন্য কঠোরতা ও কষ্টকর করতে চান না বরং তিনি তার কল্যাণ, হেদায়েত ও রহমত চান। তিনি বলেন - "আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান।মানুষ দুর্বল সৃজিত হয়েছে।" -( সূরা নিসা,আয়াত:২৬-২৮)

## • হারাম কাজে কৌশল অবলম্বন করাও হারাম।

হারামের দিকে আকর্ষণকারী সবই হারাম তেমনই হারাম কাজে কোনো ধরণের কৌশল অবলম্বনও হারাম- যা হারামে লিপ্ত হওয়ার সূক্ষ্ম কৌশল মাত্র। ইহুদিরা হারাম বস্তুকে কৌশল করে হালাল করতে চেষ্টা করেছে।এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা) বলেন,-

"তোমরা সে পথে যেয়ো না যে পথে ইহুদিরা গিয়েছে। তারা তুচ্ছ বুদ্ধি অবলম্বন করে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করতে চেয়েছে।" আরেকটি কৌশল হলো, হারাম বস্তুর নাম পরিবর্তন করা, তার মূল বস্তু ঠিক রেখে রূপ পরিবর্তন করা। যেমন: মানুষ কৌশল অবলম্বন করে সুদের নতুন নাম দিয়ে সুদ ভক্ষণ করে, বলে এটা ব্যবসার লভ্যাংশ। অথচ এটি হালাল নয়। কেননা, হাদীসে এসেছে -"মানুষের ওপর এমন এক সময় আসবে, যখন তারা সবাই সুদ খাবে।"

(সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন), "সবাই কি খাবে?"

নবী (সাঃ)বললেন, যে সরাসরি খাবে না, সে তার ধূলাবালিতেও আক্রান্ত হবে।"
(মুসনাদ আহমদ: 10191)

## • ভালো নিয়্যতের দ্বারা হারাম কাজ পূণ্যের হবে না।

একজন মুমিন ব্যক্তির সকল বৈধ কাজ, যদি সে ইবাদাতের নিয়্যতে করে তবে তা ইবাদাত হিসেবে গণ্য হবে।কিন্তু যত ভালো নিয়্যতেই করে থাকুক না কেন, উদ্দেশ্য যতই ভালো হোক, তবুও হারাম হারামই।কোনো উত্তম কাজের জন্য কোনো হারাম পদ্ধতি অবলম্বন করা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না।বরং ইসলাম প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ বৈধ পদ্ধতি অবলম্বনের প্রতি উৎসাহিত করে থাকে।কোনো ব্যক্তি সুদ, অবৈধ অর্থ, হারাম পথে উপার্জিত অর্থ দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা বা শরীয়ত সম্মত কোনো ভালো কাজ সম্পন্ন করার দ্বারা গুণাহ থেকে মুক্ত হবে না।কেননা, ইসলাম হারাম কাজ বা অর্থের ব্যাপারে নিয়্যাতকে মূল্যায়ণ করে না।নবী করীম (সা:) বলেন-
"আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্র ব্যতীত কোনো কিছুই গ্রহণ করেন না। আর তিনি নবীগণকে যা করার আদেশ দিয়েছেন, মুমিনগণকেও তাই করার আদেশ দিয়েছেন।"তারপর নবীদের সম্পর্কে আল্লাহর বাণী উল্লেখ করেন,"হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।"
(সূরা আল-মু'মিনূন, আয়াত:৫১)
আর মুমিনদের সম্পর্কে বলেছেন,"হে মুমিনগণ! তোমরা যা হালাল ও পবিত্র, তা আহার কর।"
(সূরা আল-বাকারা,আয়াত:১৭২)
এরপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এমন এক ব্যক্তির উদাহরণ দেন, যে দীর্ঘ সফরে ধূলিধূসর অবস্থায় হাত উঠিয়ে বলে, "হে প্রভু! হে প্রভু!" অথচ তার আহার হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম, এবং হারামেই সে পুষ্ট হয়েছে।"তাহলে কিভাবে তার দোয়া কবুল হবে?"
- (সহীহ মুসলিম:১০১৫)
আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) বলেন,
"যে ব্যক্তি হারাম উপার্জন করে তা থেকে সদকা করে, সে তাতে কোনো সওয়াব পাবে না; বরং তার ওপরে গুনাহই লেখা হবে। আর যদি সে তা ব্যয় করে, তাতে বরকত হবে না; আর যদি সে তা রেখে যায়, তা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের জ্বালানি হবে।"
তারপর তিনি বলেন,"আল্লাহ তাআলা মন্দ দ্বারা মন্দ দূর করেন না; বরং আল্লাহ ভালো কাজের মাধ্যমে মন্দ দূর করেন। নিশ্চয়ই অপবিত্র বস্তু দ্বারা অপবিত্রতা দূর হয় না।"
(মুসনাদ আহমাদ :৩৫৯৯)

## • হারামে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে সন্দেহমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা

হালাল ও হারামের মাঝে একটি স্তর আছে।তা হলো সন্দেহমূলক কাজ।যেগুলো কোনো দৃষ্টিতে হালাল মনে হয় আবার অন্য কারণে হারাম মনে হয়।সবচেয়ে উত্তম উপদেশ হলো, এসব সন্দেহমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা যা হারামের দিকে টেনে নিয়ে যায়। অতএব বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে দূরদৃষ্টিতে চলা।রাসুলুল্লাহ (সা:) বলেন, "হালাল স্পষ্ট, হারামও স্পষ্ট।

আর এ দুয়ের মাঝে কিছু সন্দেহজনক বিষয় আছে, যা অনেক মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়গুলো থেকে বাঁচবে, সে তার দ্বীন ও সম্মানকে রক্ষা করল। আর যে এতে লিপ্ত হলো, সে হারামে পতিত হতে পারে; যেমন রাখাল রাজা-সংরক্ষিত চারণভূমির চারপাশে গবাদি পশু চরায়, আর আশঙ্কা থাকে যে, সে চারণভূমিতে ঢুকে পড়বে। জেনে রাখ, প্রতিটি রাজ্যের একটি চারণভূমি আছে; আল্লাহর চারণভূমি হলো তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ।"(সহিহ বুখারী: ৫২,সহিহ মুসলিম: ১৫৯৯)
একজন মুমিনের উচিত এমন মানসিকতা তৈরি করা যে—"যেখানে সন্দেহ আছে, আমি সেখান থেকে দূরে থাকব।"এটাই প্রকৃত তাকওয়া (আল্লাহভীতি)।

## • হারাম সকলের জন্যই হারাম

যা আল্লাহ ও রাসূল (সা:) হারাম ঘোষণা করেছেন, তা সব মানুষের জন্যই হারাম —কোনো জাতি, বর্ণ, পেশা বা অবস্থার ভেদে এর বিধান পরিবর্তন হয় না।মানুষের কোনো ধরণের শ্রেণীবিন্যাস হিসেবে হালাল হারাম হুকুম আসেনি।কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য ব্যতিক্রম নয়। রাজা- বাদশাহ, নেতা, আলেম,ধনী, এ ধরণের পদবী কোনো ক্রমেই হারামকে হালাল করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা শরীয়তে যা হালাল করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত হালাল, যা হারাম করেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত সকলের জন্য হারাম।যেমন : চুরি করা হারাম। চোর মুসলমান হোক বা অমুসলমান, হোক ধনী বা গরীব।চোরের জন্য শাস্তি আবশ্যক।এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ একটি ঘটনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে বনু মাখযূম নামের এক সম্ভ্রান্ত ও ধনী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল।যখন তার অপরাধ প্রমাণিত হলো, তখন লোকেরা খুব চিন্তিত হলো — কারণ সে ছিল সমাজের প্রভাবশালী পরিবারের মেয়ে।
তারা ভাবল, "এত সম্মানিত পরিবারের মেয়ের হাত কেটে দিলে মানুষ কী বলবে!"তাই সাহাবারা পরামর্শ করলেন, "এই ব্যাপারে কেউ যেন নবীজির কাছে সুপারিশ করে।"অবশেষে তাঁরা উসামা ইবনু যায়েদ (রাঃ)-কে পাঠালেন — যিনি নবীজির প্রিয় সাহাবি ও দত্তকপুত্রসদৃশ ছিলেন।যখন উসামা (রাঃ) এসে সুপারিশ করলেন যেন ঐ মহিলাকে ক্ষমা করা হয়,রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর মুখমণ্ডল গম্ভীর হয়ে গেল।তিনি বললেন, "তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বিষয়ে সুপারিশ করছো?"এরপর তিনি দাঁড়িয়ে লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন:"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছিল এই কারণে যে, তারা সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার শাস্তি দিত।
আল্লাহর কসম! যদি আমার মেয়ে ফাতিমা চুরি করত, আমি তার হাতও কেটে দিতাম।"
(সহিহ বুখারী: ৩৪৭৫,সহিহ মুসলিম:১৬৮৮)

## • প্রয়োজনের তাগিদে নিষেধাজ্ঞার শিথিলতা।

"অত্যাবশ্যক প্রয়োজন (জরুরি অবস্থা) নিষিদ্ধ জিনিসকেও বৈধ করে দেয়।"এটি ইসলামে হালাল ও হারামের অন্যতম মূলনীতি। ইসলাম মানুষের জন্য সহজ ও বাস্তবধর্মী জীবনবিধান দিয়েছে।মানুষের প্রয়োজন ও দূর্বলতার কথা ইসলাম ভূলে যায় নি। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদের বোঝা হালকা করতে চান। মানুষকে তো দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।"-(সূরা নিসা,আয়াত:২৮)

কোনো অবস্থায় যদি জীবন, দেহ, ধর্ম, বুদ্ধি, বা সম্পদ রক্ষা করার জন্য হারাম কাজ না করলে ক্ষতি বা ধ্বংস হয়,তাহলে সীমিত পরিমাণে সেই হারাম কাজ অস্থায়ীভাবে অনুমোদিত হয়।এটি আল্লাহর করুণা ও ইসলামী আইনশাস্ত্রের ভারসাম্যপূর্ণদিক।

"যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে (ক্ষুধায়) হারাম খায়, কিন্তু ইচ্ছাকৃত নয় এবং সীমা অতিক্রম করে না, তার কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত:১৭৩)।যেমন:

**ক্ষুধায় মৃত্যুর আশঙ্কা:**

কেউ যদি মরার উপক্রম হয় এবং হালাল কিছু না পায়,তখন সে সীমিত পরিমাণে হারাম খাবার (যেমন মৃত প্রাণীর মাংস) খেতে পারে শুধু প্রাণ রক্ষার জন্য।

**নারী চিকিৎসক না থাকলে:**

কোনো নারীর জীবন-ঝুঁকি থাকলে, প্রয়োজনের তাগিদে পুরুষ চিকিৎসকের কাছে চিকিৎসা নেওয়া যাবে।

**যুদ্ধ বা বিপদের সময় মিথ্যা বলা:**

কারো জীবন বাঁচাতে বা রক্তপাত রোধে মিথ্যা বলা সাময়িকভাবে অনুমোদিত।

**অস্ত্র বা ওষুধে হারাম উপাদান:**

যদি বিকল্প না থাকে এবং জীবন বাঁচাতে প্রয়োজন হয়, তবে ব্যবহার করা যাবে।

ইসলাম কখনো "প্রয়োজন" নামের অজুহাতে হারামকে হালাল করে দেয় না ।এটা শুধু অত্যাবশ্যক (জরুরি) অবস্থায় এবং যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই অনুমোদিত।কেননা কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আল্লাহ তোমাদেরকে কোনো অসুবিধায় ফেলতে চান না; বরং তিনি চান তোমাদেরকে পবিত্র করতে এবং তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করতে, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।"-(সূরা মায়িদা,আয়াত:৬)

# মুসলমানের ব্যক্তিগত ও দৈনন্দিন জীবনে হালাল হারাম

- **পানাহারে হালাল- হারাম**

ইসলাম জীবনব্যবস্থার প্রতিটি দিকেই নির্দেশনা দিয়েছে— এমনকি আমরা কী খাবো, কী পান করবো তাও।আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হালাল ও পবিত্র রিজিক গ্রহণের আদেশ দিয়েছেন এবং হারাম ও অপবিত্র জিনিস থেকে বিরত থাকতে বলেছেন।তিনি কুরআনে বলেন,"হে মানুষ! পৃথিবীর যেসব বস্তু আছে, তার মধ্য থেকে হালাল ও পবিত্র জিনিসগুলো খাও।" (সূরা আল-বাকারা, আয়াত:১৬৮)

বর্তমান সময়ে খাদ্যশিল্পে নানা পরিবর্তন এসেছে—

প্রসেসড ফুড, ফাস্ট ফুড, ইমপোর্টেড পণ্য, প্রিজারভেটিভ ও কেমিক্যাল যুক্ত খাবার ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছে।অনেক পণ্যে জেলাটিন, ইমালসিফায়ার, ফ্লেভার, অ্যালকোহল বা

এনজাইম ব্যবহার করা হয়, যা অনেক সময় হারাম উৎস থেকে আসে।হালাল সার্টিফিকেট না থাকা সত্ত্বেও অনেক কোম্পানি "হালাল" দাবি করে পণ্য বিক্রি করছে।
এই কারণে আজকের দিনে সচেতন মুসলমানদের জন্য খাবার ও পানীয় নির্বাচনে হালাল - হারাম সম্পর্কে আরও বেশি সতর্ক হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে।শরীয়ত অনুযায়ী হালাল খাবারের বৈশিষ্ট্য:

1. আল্লাহর নামে জবাই করা পশু
2. অপবিত্র বা ক্ষতিকর নয়
3. সুদ, প্রতারণা বা অন্যায় লেনদেনে অর্জিত নয়
4. মানবদেহ বা নৈতিকতার জন্য ক্ষতিকর নয়।

শরীয়তে হারামের পরিধি খুবই সংকীর্ণ। কেননা, হারাম হওয়ার জন্য শরীয়তের সুস্পষ্ট যে সকল নির্দেশনা এসেছে সেগুলো সংখ্যায় একেবারে কম এবং খুবই স্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, "হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে উত্তম বস্তুসমূহে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে খাও এবং আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।তিনি তোমাদের জন্য কেবল মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে পশুর উপর আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেয়া হয়েছে, সেগুলো হারাম করেছেন।কিন্তু যে ব্যক্তি বাধ্য হয়ে পড়ে (অর্থাৎ প্রাণরক্ষার তাগিদে খায়), অন্যায় উদ্দেশ্যে নয় এবং সীমালঙ্ঘন না করে, তার জন্য কোনো পাপ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
(সূরা বাকারা,আয়াত:১৭২-৭৩)
এ আহ্বানে মুমিনদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা কেবল পবিত্র জিনিসগুলো খাওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং এ সকল নিয়ামত ভোগ করে শুকরিয়া আদায় করতে বলেছেন।এবং সুস্পষ্টভাবে চারটি জিনিসকে তিনি হারাম বলে ঘোষণা করলেন।আর ও বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে কুরআনের অন্য এক সূরায়, "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে উৎসর্গ করা হয়েছে; শ্বাসরোধে মারা যাওয়া, আঘাতে মারা যাওয়া, উঁচু থেকে পড়ে মারা যাওয়া, শিংয়ের আঘাতে মারা যাওয়া, এবং যেগুলো হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেলেছে—তবে যদি তোমরা তা যবাই করতে পারার আগে পৌঁছে যবাই করতে পারো, তবে তা বৈধ। আর যা মূর্তির সামনে যবাই করা হয়েছে এবং ভাগ্য নির্ধারণের তীর দ্বারা সিদ্ধান্ত চাওয়া - এসব পাপাচার।
(সূরা মায়িদা, আয়াত:৩)
সুতরাং ব্যাখ্যাগতভাবে হারাম ১০টি।আর এ প্রাণী গুলো হারাম হওয়ার কারণ সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে আলোচনা করা হলো:-

**মৃত প্রাণী** :- যেসব প্রাণী যবাই না করেই মারা যায়।

<u>হারাম হওয়ার কারণ :</u>

- এতে রক্ত জমে থাকে, যা জীবাণু, বিষ ও ক্ষতিকর উপাদানে ভরপুর।
- এতে পচন শুরু হয়, খাওয়ার উপযোগী থাকে না।
- শরীর ও আত্মার জন্য অপবিত্র।

**প্রবাহিত রক্ত** :-বিশেষ করে তরল রক্ত।

হারাম হওয়ার কারণ:

- রক্তে ক্ষতিকর জীবাণু, টক্সিন ও বর্জ্য পদার্থ থাকে।
- এটি নোংরা ও স্বাস্থ্যহানিকর।
- শরীরের অপবিত্র অংশ, যা পানাহার উপযোগী নয়।

## শূকরের মাংস :-

হারাম হওয়ার কারণ:

- শূকরের শরীরে বহু জীবাণু ও পরজীবী (parasite) থাকে।
- এটি অস্বাস্থ্যকর এবং বহু রোগের উৎস (যেমন: ট্রাইকাইনোসিস, টেপওয়ার্ম)।
- ইসলামী দৃষ্টিতে শূকর একটি অশুচি প্রাণী, যা নৈতিক ও আত্মিকভাবে অপবিত্র।

## আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গ করা প্রাণী:-

হারাম হওয়ার কারণ:

এটি শিরক (অংশীদার স্থাপন) এর অন্তর্ভুক্ত।

খাদ্য শুধু আল্লাহর নামে বৈধ; অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা মানে ইবাদতে অন্যকে শরিক করা। **শ্বাসরোধে মারা যাওয়া :-**

## আঘাতে মারা যাওয়া :-

## উঁচু থেকে পড়ে মারা যাওয়া :-

## শিংয়ের আঘাতে মারা যাওয়া :-

## হিংস্র জন্তু দ্বারা খাওয়া :-

- এতে যবেহের নিয়ম মানা হয় না।
- এতে জীবাণু, বিষাক্ত পদার্থ ও পচন সৃষ্টি হয়।
- এটি স্বাস্থ্য ও ধর্মীয়ভাবে উভয় দিকেই অপবিত্র।
- তবে, যদি জীবিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং ইসলামী নিয়মে যবাই করা যায়, তখন তা হালাল হয়।

## মূর্তির সামনে যবাই করা প্রাণী:-

হারাম হওয়ার কারণ:

- মূর্তির সামনে যবাই করা মানে ইবাদতকে মূর্তির উদ্দেশ্যে করা।
- এটি সরাসরি কুফরি ও শিরক।

## ভাগ্য নির্ধারণের তীর দ্বারা সিদ্ধান্ত চাওয়া

হারাম হওয়ার কারণ:

- এটি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার।
- ভাগ্য নির্ধারণ শুধু আল্লাহর হাতে, তীর টেনে তা জানা সম্ভব নয়।
- তাই এটি "ফিসক (অপরাধ, গোনাহ)" বলা হয়েছে।

সর্বোপরি "হারাম ঘোষণা করা হয় ক্ষতির জন্য, আর হালাল ঘোষণা করা হয় কল্যাণের জন্য।"

(ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম)

**মৃতপ্রাণীর মাঝে মাছ ও পঙ্গপাল অন্তর্ভুক্ত নয়:-**শরীয়ত মৃতপ্রাণী হারাম করেছে, কিন্তু মাছ ও পঙ্গপালকে ও তাদের মতো পানিতে বসবাসকারী প্রাণীকে এ হুকুমের বাইরে রেখেছে। রাসূল (সা:) বলেন, "তার পানি পবিত্র এবং মৃত হালাল।"
অর্থাৎ, সাগরের পানি পবিত্র এবং এর মৃত প্রাণীগুলোও হালাল।

## মৃতজন্তুর চামড়া, হাড্ডি ও পশম ব্যবহার:-

মৃতজন্তু হারাম কিন্তু তার চামড়া, পশম, হাড্ডি ব্যবহার হালাল।ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, "উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা (রা:) এর দাসী সদকার একটি বকরী লাভ করেছিল। পরে বকরীটি মারা গেল।যাওয়ার পথে রাসূল (সা:) ছাগলটি দেখতে পেয়ে বললেন, তোমরা কি এটির চামড়া দিয়ে দাবাগত করে উপকৃত হতে পার না? তারা বললেন,এটি মৃত। তিনি বললেন, মৃতজন্তু খাওয়াই শুধু হারাম করা হয়েছে।"
(সহীহ বুখারী: ২২৩৬, সহীহ মুসলিম :৩৬৩)
এ হুকুমটি সকল পশুর চামড়ার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এমনকি কুকুর ও শুকরের চামড়াও এ হুকুমের বাইরে নয়।

**স্থলভাগের হারাম প্রাণী:-** স্থলভাগে স্পষ্টত শুধু শুকরের গোশত হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।এছাড়া হাদীসে আছে, ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, "রাসুলুল্লাহ (সা:) সব নখ-ওয়ালা হিংস্র জন্তু এবং নখ-দ্বারা শিকার করা পাখি খেতে নিষেধ করেছেন।"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩৪)
হিংস্রপ্রাণী বলতে বোঝায়, বাঘ, শৃগাল,চিতা, আরোযে প্রাণীগুলো থাবা দিয়ে শিকার করে এবং নখ দ্বারা গোশত ছিঁড়ে খায়।

## ঠেকায় পড়লে হুকুম ভিন্ন:-

যদি কেউ বিপদে পড়ে যায় এবং হারাম বস্তু গ্রহণ করা ব্যতীত তার আর কোনো উপায় থাকেনা তবে তা গ্রহণ করা যাবে।আল্লাহ তাআলা বলেন,
"তোমাদের কী হলো যে, তোমরা এমন জিনিস খাও না যার ওপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছে?
তিনি তো তোমাদের জন্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন, কোনগুলো তোমাদের জন্য হারাম। তবে (জরুরি অবস্থায়) যেগুলোর জন্য তোমরা বাধ্য হও, তা ব্যতিক্রম।নিশ্চয়ই অনেকেই জ্ঞান ছাড়া নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে।
নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্যক জানেন।"(সূরা আল-আন'আম,আয়াত:১১৯)
এখানে প্রয়োজনীয়তা হলো খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা। কোনো ব্যক্তির ক্ষুধার্ত হওয়ার সময়সীমা এক দিন এক রাত অতিক্রম হওয়ার পরেও যদি হালাল খাবার না পাওয়া যায় তবে তার জন্য হারাম বস্তু ততটুকু খাওয়া জায়েজ, যতটুকু খেলে সে মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পাবে।এর মধ্যে তাকে হালাল খাবারের সন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। কোনো মুসলমানের জন্য এটি বৈধ নয় যে সে হারাম কোনো কিছুকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করে নিবে এবং তা পরিতৃপ্তির সাথে গ্রহণ

করবে, বরং তার জন্য আবশ্যক হলো হালাল খাদ্যের অন্বেষণ করা।যাতে করে দীর্ঘ সময়ের জন্য প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে হারাম গ্রহণ করতে না হয়।

**কোনো ব্যক্তি হারাম গ্রহণে বাধ্য নয়, যখন সমাজ তার প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম।**কেননা অন্যদের কাছে থাকা খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ দ্বারা সে হারাম খাওয়া থেকে বেচেঁ থাকতে পারে।কেননা ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই, একটি শরীরের এক একটি অংশ, একটি দেয়ালের এক একটি ইট।
ইমাম ইবনে হাজম (রহ.)— আল-মুহাল্লা গ্রন্থে বলেন যে:"যে ব্যক্তি এমন সমাজে থাকে, যেখানে তার খাদ্য, বস্ত্র ও প্রয়োজন সমাজ বা রাষ্ট্র থেকে পাওয়া সম্ভব,
তখন সে হারাম জিনিস খাওয়ার জন্য দারুরার (আবশ্যকতার)অজুহাত দিতে পারে না।"অর্থাৎ:
যদি কোনো মুসলমানের অনাহার হয়, কিন্তু তার আশেপাশে সমাজ, মুসলমানগণ বা রাষ্ট্র তাকে সহায়তা করতে সক্ষম,তাহলে সে হারাম খাদ্য খাওয়ার অনুমতি পাবে না। কারণ তার অন্য সাথীর আবশ্যক হলো তাকে খাবার খাওয়ানো।যদি এ কারণে লড়াই করতে হয় তবে সে লড়াই করবে। যদি সে লড়াই করে নিহত হয় তাহলে হত্যাকারীর ওপর কিসাস কায়েম করতে হবে। আর যদি খাবার দিতে অস্বীকারকারী নিহত হয়, তবে সে আল্লাহর লা'নতে মারা গেছে। কেননা সে ঐ লোকের অধিকার দিতে অস্বীকার করেছে। যে ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের অধিকার দিতে অস্বীকার করে তবে সে সীমালঙ্ঘনকারী। আর এ কারণে আবু বকর (রা:) যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীকে হত্যা করেছেন।

## শরীয়তসম্মত জবাই পদ্ধতি :-

গৃহপালিত পশু হালাল হওয়ার জন্য জবাই শর্ত।যবেহের শর্ত:-
(১)ধারালো ছুরি দ্বারা জবাই করতে হবে।যদিও তা পাথর বা কাঠ হয়ে থাকে।রাসূল(সা:) বলেন, "রক্ত প্রবাহিত কর,যে জিনিস দিয়েই পার এবং যবেহের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর।" এভাবে জবাই করার বিশেষ কারণ, যাতে খুব স্বল্প কষ্টে জন্তুটি মৃত্যুবরণ করে।এতে খুব দ্রুত কার্য সমাধান হয়।
(২)গলদেশে ছুরি চালাতে হবে যাতে করে পশুটির মৃত্যু নিশ্চিত হয়। জবাই করা পূর্ণ হবে খাদ্যনালী ও গলার মধ্যে বড় যে দুটি রগ আছে তা কেটে দিলে। কিন্তু যদি নির্দিষ্ট স্থানে ছুরি চালানো সম্ভব না হয়, তবে যেখানে চালানো সম্ভব সে অঙ্গে ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করবে।কেননা,এর দ্বারা খুব সহজে প্রাণীটি মৃত্যুবরণ করবে।এ কারণে নখ ও দাঁত দ্বারা জবাই করতে নিষেধ করা হয়েছে।কারণ এতে জীবজন্তু খুবই কষ্ট পায় এবং এটি অনেকটা শ্বাসরোধ করে মৃত্যুর মত।এ সম্পর্কে হাদীসে আছে, শাদ্দাদ ইবন আওস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ে উৎকৃষ্টতা (দয়াশীলতা ও উত্তম আচরণ) নির্ধারণ করেছেন। অতএব, যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন ভালোভাবে হত্যা করো আর যখন জবাই করবে, তখন সুন্দরভাবে জবাই করো। তোমাদের কেউ যেন তার ছুরিকে ভালোভাবে ধার দেয় এবং পশুকে কষ্ট না দিয়ে তাকে স্বস্তি দেয়।"-(সহীহ মুসলিম:১৯৫৫)

(৩)আল্লাহ ব্যতীত কারো নাম উচ্চারণ করা যাবে না জবাই এর সময় এবং একমাত্র আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা।একজন মুমিন ব্যক্তির জবাই এর সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে নিজেকে প্রতিবার স্মরণ করানো, আমরা এ কাজ প্রাণিদের প্রতি জিঘাংসা বশত করছি না,এ কারণেও নয় যে তারা দূর্বল, বরং এটা আল্লাহর অনুমতিক্রমেই তাকওয়ার পরীক্ষাস্বরূপ তাদেরকে জবাই করছি, শিকার করছি, খাচ্ছি।

## শিকার এর ক্ষেত্রে:-

জীবজন্তুর মধ্যে এমন অনেক আছে, যাদের গোশত পবিত্র, কিন্তু মানুষের পক্ষে তাদের পোষ মানানো সম্ভব নয়। তাই গৃহপালিত পশুদের জন্য গলায় জবাই করার যে হুকুম আবশ্যক করেছে ইসলাম বন্য পশুদের ব্যাপারে তা করে নি।সে সকল জন্তুর যে কোনো জায়গায় আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করতে পারলেই সেগুলো খাওয়া হালাল।তবে হালাল হওয়ার জন্য এতে শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে।

## শিকারীর ক্ষেত্রে :-

(১)শিকারীকে অবশ্যই মুসলিম অথবা আহলে কিতাবের মধ্যে হতে হবে। নিরর্থক কোনো প্রাণী শিকার না করা। খাওয়া অথবা অন্য কোনো উপকারের উদ্দেশ্য ব্যতীত প্রাণী হত্যা ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূল (সা:) বলেন, আবদুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বর্ণনা করেন "কোনো মানুষ যদি চড়ুই বা তার চেয়ে বড় কোনো প্রাণীকে অন্যায়ভাবে (হক আদায় না করে) হত্যা করে, তবে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করবেন। সাহাবিরা জিজ্ঞেস করলেন,হে আল্লাহর রাসূল! তার হক কী?"তিনি বললেন, "তার হক হলো , যখন জবাই করবে, তখন তা খাওয়ার উদ্দেশ্যে করবে, অযথা গলা কেটে ফেলে না ফেলবে।"-
(সুনান আন-নাসাঈ:৪৪৪৫,
সুনান ইবনু মাজাহ: ৩১৭৯,মুসনাদ আহমাদ :২/১৬০)

(২)শিকারী যেনো হজ্জ্ব বা উমরার ইহরাম বাঁধা অবস্থায় না থাকে।কেননা এ অবস্থায় একজন মুসলমান পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও নিরাপত্তায় থাকে।তার আশেপাশের পশুপাখি ও এসময় তার থেকে নিরাপদ। এটি একজন মুমিনের জন্য বিশাল পরীক্ষা যার দ্বারা একজন মুসলমান অত্যধিক ধৈর্যশীলতার পরিচয় দেয়।আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,
"হে মুমিনগণ! আল্লাহ অবশ্যই তোমাদেরকে কিছু শিকার দ্বারা পরীক্ষা করবেন — যা তোমাদের হাত ও বর্শা দ্বারা সহজে পাওয়া যাবে — যেন আল্লাহ প্রকাশ করেন কে গায়েব অবস্থায় তাঁকে ভয় করে। অতঃপর যে ব্যক্তি এর পরেও সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।"
-(সূরা মায়িদা,আয়াত:৯৪)
তিনি আরও বলেন, "তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তার খাদ্য (অর্থাৎ সাগরজাত মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণী) হালাল করা হয়েছে — তোমাদের জন্য এবং পথিকদের জন্য উপভোগ্য হিসেবে। আর স্থলজ শিকার তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে যতদিন তোমরা ইহরামের

অবস্থায় থাকবে।আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর কাছে তোমাদের একদিন একত্রিত করা হবে।”-(সূরা মায়িদা,আয়াত:৯৬)

## শিকারী প্রাণীর ক্ষেত্রে:-

এমন প্রাণী হওয়া যার গলায় ছুরি চালিয়ে জবাই করা সম্ভব নয়।যদি জবাই করা সম্ভব হয়, অবশ্যই জবাই করতে হবে। এর অন্য কোনো বিকল্প নেই।যদি বর্শা নিক্ষেপ করে বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা শিকার করার পর প্রাণিটি জীবিত পাওয়া যায়, তবে তাকে জবাই করতে হবে।কিন্তু যদি প্রাণিটি পূর্ণ জীবিত না থাকে এবং তাকে ঐ অবস্থায় মৃত্যুর জন্য রেখে দেয়া হয়, এতে কোনো গুণাহ হবে না।তবে জবাই করাটাই উত্তম।

## শিকার করার মাধ্যম সম্পর্কিত:-

- ধারালো অস্ত্র দিয়ে শিকার করা-

যেমন: তীর,তলোয়ার ও বর্শা।এখানে শর্ত ২টি-

(১)অস্ত্রটি শিকারের দেহে এমনভাবে বিদ্ধহতে হবে যে অস্ত্রের যখম পশুটির মৃত্যুর কারণ হতে হবে।অস্ত্রের ভারী হওয়ার কারণে যেন মৃত্যুবরণ না করে।

(২)অস্ত্র বা হাতিয়ার নিক্ষেপ এর সময় অবশ্যই আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা।

- কুকুর বা বাজপাখি দ্বারা শিকার করা:-

(১) শিকারী জন্তু বা পাখিটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হবে।

(২) অবশ্যই তার মালিকের জন্য শিকার করতে হবে।

(৩)শিকারী পাঠানোর সময় আল্লাহর নাম নিয়ে প্রেরণ করা।

এ সম্পর্কে একটি বিখ্যাত হাদীস রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট ভাবে এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়-

“যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত (শিকারি) কুকুরকে পাঠাও, তখন আল্লাহর নাম উল্লেখ করে পাঠাও।

যদি সে তোমার জন্যে শিকার ধরে আনে এবং তুমি তাকে জীবিত পাও, তবে তা জবাই কর।আর যদি সে তাকে হত্যা করে ফেলে এবং তাতে (কুকুরটি ছাড়া) অন্য কোনো কুকুর না থাকে, তবে তুমি তা খেতে পারো। কিন্তু যদি তুমি দেখো যে অন্য কুকুরও সেখানে আছে, তবে তা খেও না, কারণ তুমি জানো না কোন কুকুর তা হত্যা করেছে।আর যদি তুমি তীর নিক্ষেপ করো এবং তা আঘাত করে (প্রাণীটি) মারা যায়, তবে খেতে পারো, যদি তুমি আল্লাহর নাম উল্লেখ করেছিলে।”

(সহীহ বুখারী:৫৪৮৪, সহীহ মুসলিম: ১৯২৯)

- তীর নিক্ষেপ করে মৃত শিকার পেলে:-

অনেক সময় শিকারী তীর নিক্ষেপ করে লক্ষ্যভেদ করলেও শিকারকে ঠিক তৎক্ষনাৎ পাওয়া যায় না। হয়তো কয়েকদিন পর পাওয়া যায়। সেই শিকার হালাল হওয়ার ব্যাপারে শর্ত হলো -

(১) শিকার পানিতে না পড়া।

আদী ইবন হাতিম (রাঃ) থেকে বর্ণিত,

আমি নবী করীম ﷺ–কে জিজ্ঞেস করলাম,
“হে আল্লাহর রাসূল! আমি তীর ছুড়ি এবং এক বা দুই দিন পর শিকারকে পাই, যদি তাতে শুধু আমার তীরের চিহ্ন থাকে?”
তিনি বললেন:
“যদি তা পানিতে না পড়ে থাকে, তাহলে খাও;কিন্তু যদি পানিতে পড়ে থাকে, তাহলে খেও না,কারণ তুমি জানো না — পানি তাকে মেরেছে না তোমার তীর।”
(সহীহ বুখারী:৫৪৮, সহীহ মুসলিম: ১৯২৯)
(২) নিক্ষেপ করা তীরের আঘাত ব্যতীত অন্য কোনো আঘাত শিকারের দেহে না থাকা
(৩)শিকারটি যেনো পঁচে না যায়। কেননা, এটি স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

- **নেশাদায়ক সবকিছুই হারাম**

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন,
“হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, প্রতিমার উদ্দেশ্যে স্থাপিত পাথর (বেদী) এবং ভাগ্য নির্ধারণের তীর—এগুলো শয়তানের অপবিত্র কাজ। সুতরাং এগুলো থেকে দূরে থাকো, যাতে তোমরা সফল হও।শয়তান চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা কি এখনো বিরত থাকবে না?”
(সূরা মায়িদা,আয়াত:৯০-৯১)
এ দুটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা মদ্যপান ও জুয়া খেলাকে কঠোর ভাষায় হারাম করেছেন।তিনি বান্দাদেরকে এ দুটি কাজ থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিরত থাকাকেই সফলতার পথ বানিয়েছেন। নেশাজাতীয় ও চেতনানাশক দ্রব্য মানুষকে সাময়িকভাবে বুদ্ধিহীন ও বিবেকশূন্য করে ফেলে।ইসলামে সালাত, ন্যায়বিচার, সামাজিক দায়িত্ব—সবকিছুতেই বিবেক ও সুস্থ মস্তিষ্ক জরুরি।তাছাড়া নেশাজাতীয় দ্রব্য মানুষকে অন্য পাপের দিকে ঠেলে দেয়। যেমন: মারামারি, ব্যভিচার, চুরি, গালাগালি, এমনকি খুন পর্যন্ত।
নবী (সা:) বলেছেন: “মদ সব মন্দের জননী।”
(ইবনে মাজাহ: ৩৩৭১)
এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানের মতে এসব নেশাজাতীয় ও চেতনানাশক দ্রব্য -
(১)লিভার, কিডনি ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে,
(২)আসক্তি সৃষ্টি করে,
(৩)মানসিক রোগ বাড়ায়,
(৪)সন্তান জন্মে জিনগত ত্রুটি আনতে পারে।
ইসলামী শরিয়তের একটি মৌলিক সূত্র, এমন কোনো জিনিস খাওয়া বা পান করা মুসলমানদের জন্য অনুচিত, যে জিনিস তার নিজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলাম মাদক দ্রব্য হারাম করার ব্যাপারে পরিমাণের দিকে লক্ষ্য করে নি, বরং অধিক পরিমাণ গ্রহণে নেশাগ্রস্ত হয় তা পরিমাণে অল্প গ্রহণ করাও হারাম করেছে।যাতে করে কোনো ভাবে মানুষ এ পিচ্ছিল

পথে পা রেখে ধ্বংসের দিকে পড়ে না যায়।রাসূল (সা:) বলেন, "যা কিছু অধিক পরিমাণ নেশাগ্রস্ত করে, তার সামান্য পরিমাণ ও হারাম।"
-(ইমাম আহমদ,আবু দাঊদ,সুনানে তিরমিযী)

**মাদকের ব্যবসাকে** ও হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এমনকি ব্যবসা যদি কাফেরদের সাথে হয় তাও হারাম। রাসূল (সা:) মদের সাথে জড়িত ১০ ব্যক্তিকে অভিসম্পাত করেছেন।
১.যিনি মদ তৈরি করেন,
২. যার জন্য তা তৈরি করা হয়,
৩. যিনি পান করেন,
৪.যিনি বহন করেন,
৫.যার কাছে বহন করে নেয়া হয়,
৬.যিনি পান করান,
৭.যিনি বিক্রি করেন,
৮. যিনি দাম খান,
৯.যিনি ক্রয় করেন,
১০. যার জন্য ক্রয় করা হয়।
-(সুনানে আত-তিরমিযী:১২৯৫,
সুনানে আবু দাউদ: ৩৬৭৪, ইবনে মাজাহ:৩৩৮০)

**মুসলমান মদ উপহার দিতে পারে না।**মুসলমান তো পবিত্র, সুতরাং সে পবিত্র জিনিস ব্যতীত অন্যকিছু কাউকে দিতে ও পারেনা বা নিজে ও নিতে পারে না। একবার এক লোক রাসূল(সা:)কে হাদিয়া হিসেবে মদ দিতে চাইলেন।তখন রাসূল (সা:) তাকে জানিয়ে দিলেন, আল্লাহ তাআলা মদ হারাম করেছেন। লোকটি বলল, তাহলে আমি বিক্রি করে দেই? রাসূল(সা:) বললেন,যিনি মদ পান করা হারাম করেছেন, তিনি তা বিক্রি করাও হারাম করেছেন। লোকটি বলল, তাহলে আমি তা কোনো ইহুদিকে দিয়ে দিই?রাসূল(সা:) বললেন,যিনি মদ হারাম করেছেন, তিনি তা ইহুদিদেরকে উপহার হিসেবে দেয়া হারাম করেছেন। লোকটি বলল, তাহলে আমি কি করবো? রাসূল(সা:) বললেন, নিম্নভূমিতে ঢেলে দাও।

# পোশাক পরিচ্ছদ

ইসলামে পোশাক ও পরিচ্ছদে "হালাল ও হারাম" — এটি এমন একটি বিষয় যা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের নয়, বরং আদব, লজ্জাশীলতা ও তাকওয়ার (আল্লাহভীতি) সঙ্গে সম্পর্কিত।

## পোশাকের মূল উদ্দেশ্য:-

আল্লাহ বলেন—

"হে আদমসন্তান! আমি তোমাদের জন্য পোশাক তৈরি করেছি যা তোমাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখে ও সৌন্দর্যের জন্যও উপযোগী।"(সূরা আ'রাফ ৭:২৬)

অর্থাৎ, পোশাকের উদ্দেশ্য শুধু সাজসজ্জা নয়, বরং লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা ও শালীনতা বজায় রাখা।

## হালাল পোশাকের শর্ত:-

ইসলামে কোনো পোশাক "হালাল" বা বৈধ হবে যদি তা,

(১) <u>সতর (লজ্জাস্থান) ঢেকে রাখে</u>

পুরুষের জন্য: নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত।

নারীর জন্য: পুরো শরীর, মুখ ও হাত ছাড়া (নির্দিষ্ট মতভেদ আছে)।

(২) <u>অশালীন বা উস্কানিমূলক না হয়:</u>

খুব আঁটসাঁট, স্বচ্ছ বা শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফুটে ওঠে সেই পোশাক পরিধান করা হারাম।নবী বলেছেন:> "জাহান্নামের দুই শ্রেণির লোক আছে, যাদের আমি এখনো দেখিনি:একদল লোক— যাদের হাতে গরুর লেজের মতো চাবুক থাকবে, তারা তা দিয়ে মানুষকে প্রহার করবে এবং কিছু নারী— যারা পোশাক পরেও উলঙ্গ, অন্যদের আকৃষ্ট করে এবং নিজেরাও আকৃষ্ট হয়।তাদের মাথা হবে উটের কুঁজের মতো খোপা করা।তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না, অথচ জান্নাতের ঘ্রাণ বহু দূর থেকে পাওয়া যায়।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১২৮)

এ হাদীসে বলা হয়েছে তারা কাপড় পড়েও উলঙ্গ, অর্থাৎ তারা কাপড় পরিধান করবে ঠিকই, তবে সেই কাপড় তাদের শরীর ঢেকে রাখবে না। তাদের কাপড় অতি পাতলা হবে। যা তাদের অভ্যন্তরীণ অঙ্গগুলো উন্মুক্ত করে রাখবে। বর্তমানে মেয়েরা যে সকল পোশাক পরিধান করে থাকে, সেগুলো এই হাদীসের উদ্দেশ্য। উটের কুঁজের মতো বলতে বোঝানো হয়েছে - যারা চুল এমনভাবে বাঁধে বা খোপা করে, যেন মাথা উঁচু বা আকর্ষণীয় দেখায়।এটি অহংকার, সৌন্দর্য প্রদর্শন ও দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে করা নিষিদ্ধ সাজসজ্জা।বর্তমানে মহিলাদের জন্য সেলুন বা পার্লার রয়েছে যার বেশিরভাগই পুরুষরাই অত্যধিক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচালনা করে থাকে। এসব প্রতিষ্ঠানে গাইরে মাহরাম দ্বারা সাজসজ্জা একদমই নিষিদ্ধ। তার ওপর অনেক মহিলা পরচুলা নিজেদের খোপার সাথে লাগিয়ে এত উঁচু করে নেয় যা দেখতে আসলেই উটের কুঁজের মতো মনে হয়।

(৩)<u>অহংকার বা গর্ব প্রকাশের জন্য না হয়।</u>

খাদ্য, পানি, পরিধেয় সব পবিত্র বস্তু হালাল।তবে শর্ত হল, সেখানে কোনো অপচয় থাকতে পারবে না, কোনো অহংকারীভাব থাকতে পারবে না।

অপচয় হলো -হালাল বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করা।আর অহংকার হচ্ছে কোনো জিনিস অত্যধিক সৌন্দর্য প্রদর্শন করার জন্য গ্রহণ করা। এর মাধ্যমে নিজেকে মানুষের থেকে অধিক উত্তম, সম্মানিত ও মর্যাদাবান দেখানো।আল্লাহ বলেন, "আল্লাহ কোনো ঔদ্ধত্যকারীকে পছন্দ করেননা।"
(সূরা হাদীদ,আয়াত:২৩)
নবী (সা:) বলেন: "যে ব্যক্তি গর্বভরে পোশাক টেনে হাঁটে, আল্লাহ কেয়ামতের দিনে তার দিকে তাকাবেন না।"(সহীহ বুখারী: ৫৭৮৩, মুসলিম :২০৮৫)
অহংকার ও গৌরব থেকে মুসলমানদের দূরে রাখার জন্য রাসূল (সা:) খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। হাদিসে এসেছে- "যে ব্যক্তি দুনিয়ায় খ্যাতির পোশাক পরে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন এবং তাতে আগুন প্রজ্বলিত করবেন।"
— (মুসনাদে আহমাদ :২/৩৫৫)

পোশাক এমন হওয়া উচিত যাতে অহংকার, জৌলুস, বা আত্মপ্রদর্শন না থাকে।খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে বা মানুষের নজর কাড়ার জন্য পোশাক পরা ইসলামে কঠোরভাবে নিন্দিত।এজন্যই মুসলমানের পোশাক হওয়া উচিত সহজ, শালীন, পরিচ্ছন্ন এবং আল্লাহভীতির প্রতিফলনকারী।"নাফি (রহঃ) বলেন, ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আমি কী ধরণের পোশাক পরব?'তিনি বললেন, 'তুমি এমন পোশাক পরবে — যাতে নির্বোধরা তোমাকে তুচ্ছ না করে এবং জ্ঞানীরা যাতে তোমার মধ্যে দোষ খুঁজে না পায়।'"এই উক্তিটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর একটি অত্যন্ত গভীর ও ভারসাম্যপূর্ণ উক্তি।
এটি ইসলামের মধ্যপন্থা, বিনয় এবং শালীনতার সুন্দর দিকনির্দেশনা দেয়।
(৪) <u>লিঙ্গভেদ মানা:-</u> পুরুষ যেন নারীর মতো পোশাক না পরে, নারীও পুরুষের মতো নয়।সমাজ ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলার জন্য সবচেয়ে দায়ী হচ্ছে নিজের স্বভাবগত অবস্থান অস্বীকার করা এবং সৃষ্টিগত স্বভাবের বিরুদ্ধে কাজ করা। যে লোকগুলোকে আল্লাহ পুরুষ বানিয়েছে, তারা নিজেদেরকে মহিলা মনে করছে, নিজের লিঙ্গ পরিবর্তন করছে সার্জারীর মাধ্যমে অথবা মহিলাদের পোশাক পরিধান করে, আবার নারীরা পুরুষ হতে চাচ্ছে হয়তোবা সার্জারীর মাধ্যমে অথবা পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করে।যেখানে আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে এটি একটি মানসিক ব্যাধি যেটা counselling অথবা hormone supplement দিয়ে curable সেখানে এই প্রোপাগান্ডা কে পশ্চিমারা সমর্থন করছে LGBTQ অধিকারের নামে। যা এখন আমাদের মতো developing দেশ গুলো তে তারা ছড়ানোর চেষ্টা করছে, এতই সূক্ষ্মভাবে এটা ছড়ানোর চেষ্টা করছে- বিষয়টা অনেকটা এমন openly অত প্রচার প্রসার না করতে না পারলে ও কোমলমতি শিশুদের পাঠ্যপুস্তকে তারা শরীফ শরীফার গল্পের আড়ালে প্রচারণা চালাচ্ছে।আল্লাহ বলেন — "শয়তান বলেছিল: আমি অবশ্যই তাদেরকে বিভ্রান্ত করব...এবং আমি তাদেরকে নির্দেশ দেব যাতে তারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে।"---(সূরা আন-নিসা ৪:১১৯)

এই আয়াতে "আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন" (تَغْيِيرَ خَلْقِ اللَّهِ) বলতে শরীরের প্রকৃতি বা স্বাভাবিক সৃষ্টিগত গঠন বদলানো বোঝানো হয়েছে।এর মধ্যে লিঙ্গ পরিবর্তন বা জেন্ডার সার্জারিও অন্তর্ভুক্ত।

নবী (সাঃ)অভিশাপ দিয়েছেন:

"যে পুরুষ নারীর মতো পোশাক পরে এবং যে নারী পুরুষের মতো পোশাক পরে তাদের ওপর আল্লাহর লানত।"(সহীহ বুখারী; ৫৮৮৫)

(৫)হারাম উপাদান থেকে মুক্ত থাকে ।পুরুষের জন্য রেশম (সিল্ক) ও সোনার অলঙ্কার হারাম।

(সহীহ বুখারী:৫৮৩৭,সহীহ মুসলিম :২০৬৯)

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন,"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় রেশম পরিধান করবে, সে আখিরাতে তা পরিধান করতে পারবে না।"অর্থাৎ, রেশমি পোশাক দুনিয়ায় অহংকার বা বিলাসিতার কারণে পরা মানুষ আখিরাতে জান্নাতের রেশমি পোশাকের যোগ্য হবে না।

-(সহীহ বুখারী:৫৮৩২)

রেশম খুবই নরম, দামি, বিলাসবহুল কাপড়। ইসলামে পুরুষদের জন্য সরলতা, বিনয়, পরিমিত জীবনযাপন উৎসাহিত করা হয়েছে।ইসলাম চায় পুরুষ ও নারীর পোশাকে, আচরণে ও পরিচয়ে স্পষ্ট পার্থক্য থাকুক।রেশম সাধারণত নারীদের কোমলতা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।রেশম পরিধান অহংকার, আত্মগর্ব ও জৌলুসের প্রতীক, লিঙ্গ বিভ্রান্তি বা নারীর অনুকরণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যা ইসলামী চরিত্রবিরোধী।রেশমের বিলাসিতা থেকে বিরত থাকা পুরুষদের সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখায়।অবশ্য অন্যান্য পদার্থ দিয়ে তৈরী আংটি ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট হাদীসে আসেনি।নারীদের জন্য রেশম ও সোনা বৈধ।

**নিষিদ্ধ প্রাণীর চামড়াও**(যদি পাক না হয়) অপবিত্র।এ চামড়া জাতীয় পোশাক পরিধানকে হারাম বলা হয়েছে। **অবিশ্বাসী বা অন্য ধর্মের প্রতীক** যেমন ক্রস (খ্রিস্টান প্রতীক), হিন্দু দেবতার চিহ্ন, বা অন্য ধর্মীয় স্লোগানযুক্ত পোশাক পরা নিষিদ্ধ। সুতরাং **হালাল পোশাকের বৈশিষ্ট্য** সম্পর্কে বলতে চাইলে-

- শালীন ও পরিচ্ছন্ন
- তাকওয়া বা আল্লাহভীতি প্রকাশ করে
- সমাজে ভালো দৃষ্টান্ত স্থাপন করে
- অহংকার নয়, বরং বিনয়ের প্রতীক
- কোনো অপচয় নয়।

আল্লাহ বলেন, "লজ্জাশীলতার পোশাকই সর্বোত্তম।"

(সূরা আ'রাফ ৭:২৬)

# অতিরিক্ত সৌন্দর্য অবলম্বনে আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতিকরণ

- **দেহে চিত্র অংকন(ট্যাটু করা), দাঁত শানিতকরণ ও সৌন্দর্যের জন্য কাটছাট করা**

হাদীসের স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেছেন, "আল্লাহ লা'নত করেছেন সেই নারীদের ওপর যারা ট্যাটু করে এবং যারা করায়।"(সহীহ বুখারী :৫৯৩১; সহীহ মুসলিম:২১২৪)এখানে "লা'নত" মানে হলো — আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া।অর্থাৎ এটি বড় গুনাহ এবং স্পষ্ট নিষিদ্ধ কাজ।

ট্যাটু করার সময় শরীরে সূঁচ দিয়ে রঙ ঢুকিয়ে স্থায়ী দাগ তৈরি করা হয় আর ট্যাটুর কালি চামড়ার নিচে স্থায়ীভাবে ঢুকে যায়।যদিও এটি ওযু বা গোসলের সময় পানিকে বাধা দেয় না,তবুও শরীরের উপর স্থায়ী অশুচি দাগ রেখে দেয় -যা ইসলামী আদব ও পবিত্রতার দৃষ্টিতে অশোভন।অহংকার ও দুনিয়াবি অনুকরণের প্রতীক। চিকিৎসাবিজ্ঞানের দিক থেকেও ট্যাটুতে সংক্রমণ, অ্যালার্জি, রক্তবাহিত রোগের ঝুঁকি থাকে।ইসলামে শরীরের ক্ষতি করা বা অপ্রয়োজনে ব্যথা দেওয়া নিষিদ্ধ বা হারাম।

তাছাড়া ট্যাটু প্রথা মূলত অমুসলিম সমাজ থেকে এসেছে ফ্যাশন, গ্যাং বা বিশেষ প্রতীকের মাধ্যমে নিজেদের আলাদা দেখানোর জন্য।ইসলামে অহংকার বা অন্য ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ নিষিদ্ধ। কেননা,হাদীসে আছে "যে ব্যক্তি কোনো জাতির অনুকরণ করে, সে তাদেরই একজন।"

(আবু দাউদ: ৪০৩১)

- **ইসলামে দাঁতের ফাঁক করা (অর্থাৎ) কৃত্রিমভাবে দাঁতের মাঝে ফারাক সৃষ্টি করা:-**

রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন "আল্লাহ লা'নত করেছেন সেই নারীদের ওপর, যারা ভ্রু উপড়ে ফেলে, দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে (সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য), এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে।"

(সহীহ বুখারী : ৫৯৩১,সহীহ মুসলিম: ২১২৫)

তবে যদি চিকিৎসার কারণে হয় যেমন দাঁত বেঁকে গেছে, কামড়াতে সমস্যা হয়, মুখের বিকৃতি ঠিক করা দরকার তাহলে জায়েজ (বৈধ)। কারণ এটি "চিকিৎসা", সৌন্দর্য নয়। যদি কেবল সুন্দর দেখানোর জন্য হয়,তখন এটি হারাম, কারণ তা অহংকার ও অপ্রয়োজনীয় পরিবর্তন।এ থেকে বোঝা যায়, **যেকোনো ভাবে দেহের অঙ্গের পরিবর্তন করা হারাম।** বিশেষ করে বর্তমান যুগের পুরুষ ও মহিলারা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য এগুলোর পেছনে অনেক অর্থ ব্যয় করে অপচয় করে। তারা বিভিন্ন অপারেশনের দ্বারা নিজেদের নাক, বক্ষসহ দেহের অন্যান্য অঙ্গগুলোর পরিবর্তন করে থাকে। এদের প্রত্যেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা:) এর অভিসম্পাতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা এগুলো করতে মানুষকে কষ্ট অনুভব করতে হয় এবং এর দ্বারা আল্লাহর সৃষ্টির বিকৃতি হয়। আর কারো যদি জন্মগতভাবে

শরীরে কোনো ত্রুটি থাকে যা তার স্বাভাবিক কার্যক্রম সম্পাদনা করতে কষ্টের কারণ হয়, তখন সেই অতিরিক্ত অংশ অপারেশন করা যাবে। তবে এখানে নিয়ত থাকতে হবে শারীরিক কষ্ট দূরকরণ।

- **ভ্রু সরুকরণ:-**

মাত্রাতিরিক্ত সৌন্দর্য লাভ করার জন্যে শরীরের কোনো জায়গার পশম উপড়ানো শরীয়ত হারাম ঘোষণা করেছে।এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে, ভ্রুর চুলগুলো উপড়িয়ে ভ্রু কে চিকন করা। হাদিসে এসেছে -

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,"আল্লাহ লা'নত করেছেন সেই নারীদের ওপর যারা ভ্রু উপড়ে ফেলে,যারা করায় , যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে, এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টি পরিবর্তন করে।"

( সহীহ বুখারী: ৫৯৩১,সহীহ মুসলিম:২১২৫)

মুখমণ্ডলের পশম উপড়ানো নিয়ে দ্বিমত রয়েছে।

- **পরচুলা লাগানো:-**

রাসূল (সা:) এ ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।এমনকি ঐ মহিলার জন্য এটি জায়েয হবে না, যে মহিলার কোনো রোগের কারণে চুল পড়ে গেছে। যদিও সেই মহিলাকে নববধু হিসেবে বাসর ঘরে দেয়া হয়। হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত, এক আনসারী মেয়ের বিয়ে হয়েছিল। অসুস্থতার কারণে ইতোপূর্বে তার চুল পড়ে গেল। তখন সেই আলগা চুল লাগাতে চাইল। সে এ ব্যাপারে রাসূল(সা:) কে জিজ্ঞেস করলে,ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা:) বললেন, আল্লাহ লা'নত করেছেন সেই নারীকে, যে চুল জোড়া লাগায় এবং যে চুল জোড়া লাগাতে বলে।"(সহীহ বুখারী: ৫৯৩৩, সহীহ মুসলিম: ২১২২)

এখানে চুলের সাথে চুল সংযুক্ত করা বোঝানো হয়েছে। চাই সেই চুল আসল অথবা নকল। এটি একটি ধোঁকা ও প্রতারণা। তবে সুতা বা বস্ত্রখন্ডসহ আরো অন্যান্য বস্তু চুলের সাথে জড়ানো হলে যেমন: পশম ও রেশমী কাপড় ইত্যাদি নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হবে না। সাঈদ বিন জুবাইর (রা:) বলেন,

"রেশমী বা খোপা বানানোর পশম জড়ালে কোনো সমস্যা হবে না।"

- **খেজাব লাগানো:-**

বর্ণিত আছে যে, ইহুদি ও খ্রিস্টানরা দাঁড়ি ও চুলে খেজাব লাগাতে নিষেধ করত। এ ধারণাবশত, সৌন্দর্য ও রঙীনতা ইবাদাত ও দ্বীনদারিতায় প্রভাব ফেলবে। কিন্তু রাসূল (সা:) তাদের অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন এবং তাদের পথে চলতেও নিষেধ করেছেন। যাতে করে প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানদের স্বতন্ত্রভাব থাকে।তিনি বলেন, "নিশ্চয়ই ইহুদি ও নাসারারা চুলে রং (খেজাব) করে না; সুতরাং তোমরা তাদের বিরোধিতা কর।" (সহীহ মুসলিম:২১০৩)

পুরুষদের জন্য খেজাব করা মুস্তাহাব, বিশেষ করে যখন চুল পেকে যায়। তবে কালো রং নিষিদ্ধ (সর্বাধিক আলেমের মতে),কারণ নবী (সাঃ)বলেছেন,

"কালো রং ব্যবহার করো না।" (আবু দাউদ:৪২১২)

তাই হেনা, কাতাম, মেহেদি ইত্যাদি প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করা সুন্নত ও প্রশংসনীয়। তবে আবু কুহাফা (রা:) এর মতে, যাদের কম বয়সেই চুল সাদা হয়ে যায়,তাদের জন্য কালো রং লাগালে গুণাহ হবে না।কিন্তু যারা বার্ধক্যে পা রেখেছেন, তাদের জন্য কালো রং দিয়ে খেজাব করা সমীচীন নয়।

- **দাঁড়ি ছাটা :-**

চার মাজহাবের ইমামগণ (হানাফি, মালিকি, শাফেয়ি, হাম্বলি) সবার মতে, তাঁরা দাঁড়ি রাখা ওয়াজিব বলেছেন,আর ইচ্ছাকৃতভাবে তা কাটা বা ছোট করা হারাম বা গুরুতর গোনাহ বলেছেন।সহীহ বুখারী ও মুসলিমে এসেছে:"দাঁড়ি বাড়াও এবং গোঁফ ছোট করো; আগুন উপাসকদের (মাজুসীদের) বিরোধিতা করো।" (সহীহ বুখারী :৫৮৯২, সহীহ মুসলিম:২৫৯)
অন্য এক বর্ণনায়:"গোঁফ ছেঁটে দাও, দাঁড়ি বাড়াও; ইহুদিদের বিরোধিতা করো।"( সহীহ মুসলিম:২৬০)
ইসলাম দাঁড়িকে পুরুষত্ব ও সুন্নাতের নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছে।দাঁড়ি রাখা শুধু বাহ্যিক সাজ নয়; এটি ইবাদতের অংশ ও রাসূল (সাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ।নবী (সাঃ)বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত থেকে বিমুখ হলো, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"( সহীহ বুখারী :৫০৬৩)

# ইসলামে প্রাণীর প্রতিকৃতি

মুসলমানদের ঘরে জীবন্ত প্রাণীর প্রতিকৃতি রাখা হারাম।ইসলামে প্রতিকৃতি তৈরী করাকেও হারাম বলা হয়েছে। এমনকি যদি তা অমুসলিমদের জন্যও তৈরী করা হয়। রাসূল(সাঃ) বলেছেন:"যে ব্যক্তি কোনো জীবন্ত প্রাণীর ছবি আঁকে,কিয়ামতের দিন তাকে সে ছবিতে প্রাণ দিতে বলা হবে। অথচ সে তা দিতে পারবে না।"
(সহীহ বুখারী :৫৯৫১,সহীহ মুসলিম :২১০৭)
অন্য বর্ণনায় এসেছে, "ফেরেশতারা এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যেখানে কুকুর বা ছবি থাকে।" (সহীহ বুখারী :৩২২৫, সহীহ মুসলিম :২১০৬)

- **মহাপুরুষদের স্মৃতি রক্ষায় প্রতিকৃতি:-**

ইসলাম মহাপুরুষদের অতি ভক্তি প্রদর্শন করা কখনই পছন্দ করে না।তার মর্যাদা যত উপরেই হোক না। রাসূল (সা:) বলেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেমন করে খ্রিস্টানরা মারইয়ামের পুত্র ঈসা (আঃ)-এর প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করেছিল।নিশ্চয়ই আমি একজন বান্দা। তোমরা (আমার সম্পর্কে) বলো, 'আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'" (সহীহ বুখারী: ৩৪৪৫)
এখানে রাসূল(সা:) এই বলে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন যেন তাঁকে মানবীয় সীমার বাইরে উন্নীত না করে,নবীর প্রতি ভালোবাসা ও সম্মান যতই গভীর হোক না কেন,তাঁকে ইলাহী মর্যাদা প্রদান করা, দোআ করা, বা সাহায্য চাওয়া এসব শিরকের দিকে নিয়ে যায়।বর্ণিত আছে, রাসূল (সা:) বলেন,"হে লোকসকল! তোমরা আমাকে আমার মর্যাদার ঊর্ধ্বে উন্নীত করো না।আমি তো কেবল আল্লাহর বান্দা।তাই তোমরা বলো, 'আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'।এবং শয়তান যেন তোমাদেরকে (এই ব্যাপারে) বিভ্রান্ত করতে না পারে।আল্লাহ তাআলা আমাকে যে মর্যাদা দিয়েছেন, তোমরা যেন এর চেয়ে উঁচুতে আমাকে উন্নীত না করো।"( মুসনাদে আহমাদ: ১২৫০০)
কোনো ব্যক্তিকে সম্মান করতে গিয়ে তাকে মানুষের সম্মানের মূর্তির ন্যায় পেশ করা এবং এর জন্য হাজার হাজার টাকা অপচয় করা ইসলাম কখনই সমর্থন করে না।চিরস্মরণীয় হওয়া বাস্তবে মুমিনগণ আল্লাহর কাছে আশা করেন। অনেক মহাপুরুষ আছেন যারা দুনিয়াতে মানুষের কাছে অপরিচিত কিন্তু আল্লাহর কাছে তারা খুবই পরিচিত। কেননা আল্লাহ তাআলা সেই সকল আল্লাহভীরু ও পূণ্যবানদের ভালোবাসেন, যারা মজলিসে আসলে কেউ তাদের চিনবেন না এবং মজলিস থেকে চলে গেলে কেউ তাদের খুঁজবেন না।সত্যিই যদি মানুষের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে হয়, তবে তা প্রতিকৃতি ভাস্কর্য তৈরী করে নয়, বাস্তব পদ্ধতি হল, মানুষের চিন্তা চেতনায়, অন্তরে, স্থায়িত্ব গ্রহণ করে। একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে এ সম্পর্কে ।

মদিনায় এক বুড়ি অন্ধ মহিলা ছিলেন। যিনি এতই বৃদ্ধ ছিলেন যার নিজের দেখে চলার বা কারো ওপর নির্ভর করার মতো কেউ ছিলেন না। আবু বকর (রা.) প্রতিদিন ফজরের পর গোপনে তার বাড়ি যেতেন — পরিষ্কার করতেন, খাবার পরিবেশন করতেন, পানিসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু তিনি গুছিয়ে দিয়ে যেতেন। হযরত ওমর(রা:) খেয়াল করলেন, আবু

বকর (রা:) ফজরের পর কোথায় যেনো যান এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর তিনি ফেরত আসেন। একদিন তিনি আবু বকর (রা:) এর পিছু নিলেন, দেখতে চাইলেন, আসলে তিনি কোথায় যান বা কি করেন? তিনি দেখতে পান হযরত আবু বকর (রা:) একজন বৃদ্ধ মহিলার সেবা করেন প্রতিদিনই ফজরের পর।আবু বকর (রা.) মৃত্যুর পরে উমর (রা.) সেই দায়িত্ব কিছুদিন চালিয়ে যান। একদিন মহিলার সামনে নিয়ম মাফিক কিছু খেজুর পরিবেশন করেন। তখন— ওই মহিলা বললেন, "আপনার বন্ধু কি মারা গেছেন?" উমর (রা.) বললেন: "আপনি কীভাবে জানলেন?" তিনি বললেন: 'আপনি আমাকে খেজুরগুলো এনে দিয়েছেন কিন্তু তার বীজগুলো সরাননি।'চিরস্মরণীয় হওয়ার জন্য অতি ভক্তি, অতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন হয় না, যে সকল কল্যাণমূলক কাজ সে মানুষের উপকারে করে যাবে তা মানুষের মুখে সত্যিকারই থাকবে। আর এটাই হবে আসল স্মৃতি ও স্বরণী।

- **শিশুদের খেলাধুলায় অনুমতি :-**

অধিকাংশ আলেমদের মতে, বাচ্চাদের প্রতিকৃতি দিয়ে খেলা হারাম। রাসূল (সা:) এর শেষ জীবনে এ ব্যাপারে কঠিনভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

- **অসম্পূর্ণ বিকৃত প্রতিকৃতি:-**

হাদীসে আছে - জিবরাইল (আ:) একদিন রাসূল(সা:) এর ঘরে প্রবেশ করা থেকে বিরত ছিলেন, ঘরের দরজায় প্রতিকৃতি থাকার কারণে। দ্বিতীয় দিন এসে ও তিনি ঘরে প্রবেশ করেননি। এমনকি তিনি রাসূল (সা:) কে বলেন, "প্রতিকৃতিটির মাথা ছেদ করে দিন তাহলে তা গাছের আকৃতির মতো হবে।"
এখানে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার দ্বারা জিবরাইল (আ:) চেয়েছেন, প্রতিকৃতিটি যেন গাছের মতো হয়ে যায়। মস্তক ছিন্ন করার উদ্দেশ্য হল, এটি দেখে যাতে কারো অন্তরে শ্রদ্ধা ভক্তি জাগ্রত না হয়।

- **দেহহীন অংকন:-**

যদি অঙ্কনটি এমন হয় যে জীবিত প্রাণীর সম্পূর্ণ রূপ নেই। যেমন:
(১)মুখ বা চোখ নেই,
(২)শুধু ছায়া বা পেছন দিকের অবয়ব,
(৩) শরীরের অংশ যেমন হাত-পা, বা মাথাবিহীন দেহ,
তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এটি হারাম নয় (মাকরূহ বা অনুমোদনযোগ্য), কারণ এতে "জীবন্ত প্রাণীর সম্পূর্ণ সৃষ্টি" হয় না।ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেছেন: "যদি তুমি অবশ্যই ছবি আঁকতেই চাও, তবে গাছ, নির্জীব বস্তু বা এমন কিছু আঁকো যা প্রাণহীন।"(সহীহ মুসলিম ২১১০)
আর অনেক ফিকহ আলেম বলেন, যদি মুখের বৈশিষ্ট্য বাদ দেওয়া হয় (যেমন চোখ, নাক, মুখ), তাহলে তা জীবন্ত প্রাণীর রূপ ধরা হয় না, সুতরাং হারাম নয়। যে লোক আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য করার জন্য কোনো কিছু অংকন করবে। অর্থাৎ সে এর দ্বারা দাবি করবে, সে আল্লাহর মতো সৃষ্টি করতে পারে। যদি সে এ উদ্দেশ্যেই করে থাকে তবে সে ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে। এ ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে অংকনকারীর নিয়তের ওপর।

ইসলামে জীবন্ত প্রাণীর (মানুষ, প্রাণী, পাখি ইত্যাদি) পূর্ণাঙ্গ ছবি বা মূর্তি আঁকা, তৈরি করা বা সংরক্ষণ করা নিষিদ্ধ (হারাম) বলা হয়েছে, কারণ তা সৃষ্টিকর্তার অনুকরণ ও শিরকের আশঙ্কা সৃষ্টি করে।
রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেনঃ"যারা ছবি আঁকে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং বলা হবে, 'যা সৃষ্টি করেছো, তাকে প্রাণ দাও।'"
(সহীহ বুখারী :৫৯৫৩, সহীহ মুসলিম :২১০৭)
যে সকল প্রতিচ্ছবি দেয়ালে, কাগজে, কাপড়ে অংকন করা হয়ে থাকে সেগুলো হারাম হওয়ার ব্যাপারে স্পষ্ট কোনো সহীহ হাদিসে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি। রাসূল(সাঃ) বলেন,
"ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে কুকুর বা কোনো ছবি (প্রতিকৃতি) থাকে।"
(সহীহ বুখারী :৩২২৫, সহীহ মুসলিম :২১০৬)

হযরত আয়েশা থেকে বর্ণিত,
"আমার কাছে একটি কাপড় ছিল, যাতে ছবি (পাখির নকশা) অঙ্কিত ছিল। আমি সেটি পর্দা হিসেবে টানিয়ে রাখতাম। রাসূলুল্লাহ(সাঃ) যখনই সেটি দেখতেন, বলতেন, 'এটি সরিয়ে দাও, কারণ আমি যখনই এতে তাকাই, তখন দুনিয়ার কথা মনে পড়ে।'"( সহীহ বুখারী : ৫৬১১, সহীহ মুসলিম :২১০৭)
এখানে নবী করিম (সাঃ) কাপড়টি ছিড়েঁ ফেলতে বলেননি, সরিয়ে নিতে বলেন। কেননা, রাসূল (সা:) সে সকল জিনিস অপছন্দ করতেন যেগুলো দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট করে। তাছাড়া রাসূল (সা:) সুন্নত ও নফল নামজগুলো বাসায় আদায় করতেন। এ কারণে এ সকল নকশাকার চাদর যদি অন্তরকে আকর্ষিত করে তবে আল্লাহর প্রতি একাগ্রতাসহ ইবাদাত করার ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়াবে। যখন চিত্র অংকন প্রাণী ব্যতীত লতাপাতা, গাছপালা ইত্যাদি ভালো কাজের বাধা হয়ে দাঁড়াবে অথবা অতি বিলাসিতার দিকে নিয়ে যাবে, এমন হলে তা মাকরুহের পর্যায়ে পড়বে। সে সকল অংকিত ছবি যেগুলোকে সম্মান বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না। কিন্তু তা অপচয় ও অতি বিলাসিতার কাজ হিসেবে গণ্য এবং তা দ্বারা দেয়াল ঢেকে দেয়া হয়। এগুলো মাকরুহের পর্যায়ে পড়বে।

- **ফটোগ্রাফির ছবি:-**

এর মাধ্যমে ছবি তোলা জায়েয। ছবি হারাম হওয়ার পেছনে কি উদ্দেশ্যে অংকন বা ছবিটি কি উদ্দেশ্যে তোলা হচ্ছে সেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অংকনকারীর নিয়ত কি অথবা ফটোগ্রাফারের নিয়ত কি? যে ছবি তোলার উদ্দেশ্য ইসলামী আকীদা, বিশ্বাস ও শরীয়তের বিরুদ্ধে, তাহলে সে ছবি হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই। যেমন: নগ্ন অর্ধনগ্ন মহিলার ছবি, এ রকম কোনো ছবি যা মানুষকে দুনিয়ামুখী করে তোলে। এসব ছবি তোলা সম্পূর্ণরূপে হারাম। প্রয়োজন হলে ছবি তোলা বৈধ। যেমন:- পাসপোর্ট, আইডি কার্ড তৈরীতে।

# বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালন

বিনা প্রয়োজনে কুকুর পালনকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে যে সকল কুকুর শিকার অথবা পাহারা দেয়ার জন্য পালা হয় সেগুলো বৈধ। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন,যে ব্যক্তি শিকারী, ক্ষেত বা গৃহ পাহারা দেওয়ার কুকুর ছাড়া অন্য কোনো কুকুর রাখবে, তার আমলনামা থেকে প্রতিদিন এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব কমে যাবে।"

( সহীহ বুখারী :৫০৫৯, সহীহ মুসলিম :১৫৭৪)

এক কিরাত হলো এক বিশাল পরিমাণ সওয়াব। কিছু বর্ণনায় বলা হয়েছে,"উহুদের পর্বতের সমান।"

অর্থাৎ, এক কিরাত পরিমাণ সওয়াব হারানো মানে বড় ক্ষতি।

আধুনিক বিজ্ঞানের মতে, কুকুরের শরীরে এক ধরণের জীবাণু থাকে যার নাম Echinococcus granulosus। এর অপর নাম Hydatid Worm। যা প্রাণীদেহে Hydatid cyst নামে মারাত্মক রোগ তৈরী করে। এ জীবাণু প্রথমে মানুষের কলিজায় প্রবেশ করে। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে ফুসফুসে, মস্তিষ্কে এবং শরীরের আরও নানাবিধ অংশে। এ জীবাণু এতই সূক্ষ যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। আর এই রোগের চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। জার্মান চিকিৎসাবিদগণ বলছেন, যে সকল ঘরে কুকুর পালা হয়, সে সকল ঘরের প্রতি ১০০ জন মানুষের মধ্যে প্রতি একজন সদস্য সেই জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন। রাসূল (সা:) সেই ১৪০০ বছর আগে কুকুরের সাথে অতিরিক্ত মেলামেশাকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন,

তিনি কুকুরের উচ্ছিষ্ট থেকেও সাবধান করেছিলেন এবং বিনা কারণে কুকুর পোষা থেকেও বিরত করেছিলেন।তখন তো কোনো আধুনিক বিজ্ঞান ছিল না, জীবাণু বা ভাইরাসের ধারণাও মানুষ জানত না।

কিন্তু আজকের আধুনিক বিজ্ঞান সেই নবীজির কথার সঙ্গেই সম্পূর্ণ একমত। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে, কুকুরের শরীর ও লালায় ক্ষতিকর জীবাণু থাকে, যা মানুষের জন্য আজ প্রমাণ করেছে, কুকুরের শরীর ও লালায় ক্ষতিকর জীবাণু থাকে, যা মানুষের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

# কর্মে সক্ষম ব্যক্তি নিষ্কর্মা বসে থাকা হারাম

ইবাদাতের নাম করে বা আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের কথা বলে কোনো মুসলমানের জন্য রিযিক অন্বেষণ করা বা উপার্জন করা থেকে বিরত থাকা কোনোভাবে বৈধ নয়। কোনো সক্ষম মুসলমানদের জন্য দান-সদকার ওপর নির্ভর করে বসে থাকা বৈধ নয়। রাসূল(সা:) বলেন, "যে ব্যক্তি মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় অথচ তার প্রয়োজন নেই, সে এমনভাবে চাচ্ছে যেন সে নিজের মুখে আগুনের অঙ্গার দিচ্ছে।"
(সহীহ বুখারী: ১৪৭৪; সহীহ মুসলিম: ১০৪১)
তিনি আরও বলেন, "যে ব্যক্তি সর্বদা ভিক্ষা করতে থাকে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার মুখে একটিও মাংস অবশিষ্ট থাকবে না।"(সহীহ বুখারী:১৪৭৫; সহীহ মুসলিম: ১০৪০)
তবে এতে ছাড় দেয়া হয়েছে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়তার তাগিদে। কোনো লোক যদি সক্ষম না হয় তাহলে তার জন্য সরকার বা সাধারণ জনতার কাছে সাহায্য চাওয়া হারাম নয়। তবে ইসলামে কাজ করাকে সমর্থন করা হয়েছে। মানুষ কোনো কাজকে ছোট মনে করবে, রাসূল (সা:) সর্বদা এ চিন্তার বিরোধিতা করেছেন। তিনি এ শিক্ষা দিয়েছেন, সম্মান এবং সফলতা শুধু কর্মে এবং অন্যের ওপর নির্ভরশীলতায় শুধু লাঞ্ছনা। আল্লাহ সৎকর্ম কে হালাম করেছেন, কিন্তু কিছু কর্মকে হারাম করা হয়েছে। যেমন:-

- **হারাম চাষাবাদ:-**

ইসলাম যে সকল উদ্ভিদ খাওয়া হারাম করেছে এবং যে উদ্ভিদ শুধু ক্ষতও বয়ে আনে সেগুলোর চাষাবাদ হারাম। যেমন:- গাঁজা ও আফিম। তেমনিভাবে ধুমপান যদি হারাম হয়, তবে সেটির কাচামালের চাষাবাদ করা ও হারাম আর যদি মাকরুহ হয়, সেটির চাষাবাদ করাও মাকরুহ।কোনো মুসলমান অমুসলিমদের জন্যে ও এসকল হারাম পণ্য উৎপাদন করতে পারবে না। কেননা, মুসলমানদের ওপর হারামকৃত জিনিসের প্রসার করাও তাদের জন্য হারাম। যেমনিভাবে খ্রিস্টানদের কাছে বিক্রি করার জন্য শুকর লাল পালন করা জায়েয নাই। যদি এমনও হয় মদ বানানোর জন্য কেউ আঙ্গুর চাইছে তার কাছে হালাল ফল আঙ্গুর ও বিক্রি করা ইসলাম হারাম করেছে৷

- **দেহ ব্যবসা/যৌন পেশা:-**

ইসলাম সম্পূর্ণরূপে এটি নিষেধ করেছে। কোনো স্বাধীন মহিলা বা দাসীর জন্যে লজ্জ্বাস্থান দ্বারা আয় বৈধ করা হয় নি। আল্লাহ তাআলা বলেন,
" তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের লালসায় তাদের ব্যভিচারে বাধ্য করো না।"-( সূরা নূর, আয়াত:৩৩)

- **নৃত্য ও অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি :-**

এমন কোনে কাজের বৈধতা ইসলামে দেয়া হয়নি যার দ্বারা মানুষ হারামের দিকে অগ্রসর হবে। অশ্লীল গান, নির্লজ্জ অভিনয় সহ এ জাতীয় নিরর্থক সকল কাজই ইসলাম হারাম করেছে। বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত কোনে পুরুষ ও নারীর শারীরিক সম্পর্ক ইসলাম সম্পূর্ণ

হারাম করেছে। এ সকল কাজের দিকে ধাবিত করে এমন সব কথা -কাজ, অঙ্গভঙ্গিও ইসলাম হারাম করেছে। কুরআন বলা হয়েছে -
“আর তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।”-
(সূরা ইসরা, আয়াত:৩২)

# ব্যবসা করে উপার্জন

ব্যবসার জন্য দেশ - বিদেশ সফরকে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এটিকে আল্লাহর অনুগ্রহ অন্বেষণ নামে নামকরণ করা হয়েছে। রাসূল(সা:) বলেন,
“বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী নবীগণ, সিদ্দীকগণ ও শহীদগণের সঙ্গে অবস্থান করবে।”
(সুনান তিরমিজি: ১২০৯)
রাসূল(সা:) ব্যবসায়ীদেরকে আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদ ও শহীদের মর্যাদা দান করেছেন। কেননা আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, জিহাদ কেবল যুদ্ধের ময়দানেই হয় না, জিহাদ অর্থনৈতিক ময়দানে ও হয়।ব্যবসার ক্ষেত্রে সর্বদা লোভ লালসার ধোঁকার স্বীকার হতে হয়, আরও লাভ, আর ও মুনাফার চিন্তায়, মানুষ সব ধরণের অপকর্মে জড়িয়ে পড়ে। ব্যবসায়ীর জন্য আল্লাহর ওয়াদা, যদি তারা সৎপথে ব্যবসা করে, লোভ লালসা না করে, আমানতদারিতা বজায় রেখে সুদমুক্ত ব্যবসা করেন হালাল রোজগারের উদ্দেশ্যে, তারা আল্লাহর কাছে উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন, আখিরাতে বিশাল পুরষ্কার লাভ করবেন।

- **হারাম ব্যবসা:-**

যে সকল ব্যবসায় জুলুম, ধোঁকাবাজী, প্রতারণা, ঠগবাজী আছে সে সকল ব্যবসা হারাম। যেমন:- মদ ও মাদকজাতীয় ব্যবসা, শুকর, মূর্তির ব্যবসা ইত্যাদি। ব্যবসা হতে হবে এমন - যেখানে ক্রেতাও বিক্রেতা উভয়ই সন্তুষ্টি থাকবে এবং একজনের লাভ হবে, আরেকজনের ক্ষতি হবে এমনটি করা যাবে না। ব্যবসায়ীদের কিছু গুণ থাকা উচিত যা তাকে হালাল ব্যবসা করতে সাহায্য করবে।
(১) সে সবসময় সত্য কথা বলবে। মিথ্যা ব্যবসায়ীদের জন্য বড় মসিবত। আর মিথ্যা পাপের দিকে টেনে নেয়।আর পাপ জাহান্নামের দিকে টেনে নেয়। বিশেষ করে মিথ্যা শপথ থেকে বেঁচে থাকা কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন, “তিন শ্রেণির লোক আছে, যাদের প্রতি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি —তাদের একজন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথের মাধ্যমে নিজের পণ্য বিক্রি করে।”(সহীহ মুসলিম:১০৬,
সহীহ বুখারী: ২৬৭২)
(২)ধোঁকাবাজি থেকে বিরত থাকা।
(৩)ব্যবসায়ীরা পরিমাণে কম দেয়া থেকে বিরত থাকবে। গুণগত মানও বজায় রাখবে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,
“যারা মাপে কম দেয়, তাদের জন্যে দুর্ভোগ।”
-(সূরা মুতাফফিফীন :১)

(৪) অযথা ব্যবসাপণ্য মজুত রেখে বাজারে আতঙ্ক ছড়ানো থেকে বিরত থাকা। কেননা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল এরকম মজুতকারী ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। ইসলামে ব্যবসার পণ্য মজুত (অর্থাৎ কৃত্রিমভাবে সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পণ্য ধরে রাখা) হারাম বা গুরুতর গুনাহ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।
কেননা,রাসূলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি খাদ্যদ্রব্য মজুত করে (দামের বৃদ্ধি ও মানুষের কষ্টের আশায়), সে পাপী।"(সহীহ মুসলিম: ১৬০৫)
আরও এক বর্ণনায় এসেছে, "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্যদ্রব্য মজুত রাখে (মূল্যবৃদ্ধির আশায়), সে আল্লাহ থেকে মুক্ত এবং আল্লাহও তার থেকে মুক্ত।"
(মুসনাদে আহমদ: ৮৯৯০)
দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে পণ্য আটকে রাখা মানুষের মৌলিক প্রয়োজনের ওপর অত্যাচার।কৃত্রিম সংকট তৈরি করে বেশি দামে বিক্রি করা প্রতারণা ও শোষণ।
এতে দরিদ্র মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ধনী ব্যবসায়ী আরও ধনী হয় — যা ইসলামী অর্থনীতির বিপরীত। রাসূল(সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি দামের বৃদ্ধি ও মানুষের কষ্টের সময় বিক্রি করে (অর্থাৎ সহজলভ্য করে দেয়), আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন।"
(সুনানে ইবন মাজাহ, হাদীস: ২১৫৩)
(৫) অবশ্যই সুদ থেকে বেঁচে থাকা।যে ব্যবসায় সুদ বা সুদের মতো লেনদেন থাকে, তা হারাম।কারণ এতে এক পক্ষ লাভবান হয়, অন্য পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সুদে ধনী আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব হয়। সুদ অর্থের প্রকৃত প্রবাহে বাধা দেয়। ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কমে যায়, ধন কেবল কিছু মানুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়।এটি সমাজে শোষণ সৃষ্টি করে।
এটি অন্যায়।আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতের দিনে এমনভাবে উঠবে, যেমন শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত:২৭৫)
আরও বলেছেন, "আল্লাহ সুদকে ধ্বংস করেন, আর দান-সদকায় বরকত দান করেন।"
(সূরা আল-বাকারা :২৭৬)
এবং কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন —
"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং যদি তোমরা সত্যিকার মুমিন হও তবে সুদের অবশিষ্ট অংশ ত্যাগ করো।যদি তা না করো, তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"
(সূরা আল-বাকারা, আয়াত:২৭৮-২৭৯)
সুদ এর শাস্তি সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,
"কোনো ব্যক্তি জেনে-শুনে এক দিরহাম সুদ খেলে, তা ছত্রিশবার ব্যভিচার করার চেয়েও গুরুতর পাপ।"
(মুসনাদে আহমদ:২১৯৫৭; আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান: ৫৫১৫)

- **চাকরির ক্ষেত্রে হারাম :-**

চাকরি করে উপার্জন ইসলামে বৈধ।যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমান সেই চাকরির যোগ্য থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত সেই চাকরি করা তার জন্য বৈধ। কিনৃতু যার মধ্যে সে যোগ্যতা নেই, তার জন্য সেই চাকরি করা অবৈধ।বিশেষ করে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে।রাসূল (সা:) বলেন,

“বিচারক তিন প্রকারের —

(১) যে ব্যক্তি সত্য জেনে ন্যায়বিচার করে — সে জান্নাতে যাবে(২) যে সত্য জেনে অন্যায় রায় দেয় — সে জাহান্নামে যাবে(৩) যে অজ্ঞ, অথচ বিচারকের দায়িত্ব নেয় এবং ভুল রায় দেয় — সেও জাহান্নামে যাবে।”(আবু দাউদ: ৩৫৭৩; তিরমিজি: ১৩২২)

তিনি আরও বলেন, “যে ব্যক্তি বিচারকের পদে নিযুক্ত হলো, সে যেন গলায় ছুরি ঝুলিয়ে নিয়েছে।”

(সুনান ইবন মাজাহ: ২৩১৫)

তাছাড়া মুসলমানদের জন্য এমন কোনো সেনাবাহিনীতে চাকুরী করা বৈধ নয়, যেখানে সৈন্যরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সেই অস্ত্র কারখানায় ও কাজ করা বৈধ হবে না যেখানে মুসলমান নিধন করার জন্য অস্ত্র তৈরী হয়। আধুনিক সময়ে এমন অনেক প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে নতুন নতুন প্রযুক্তি তৈরী হয় যেমন : ড্রোন,আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে তৈরী রোবট, বিভিন্ন অ্যানিমেশনের মাধ্যমে সমকামিতা কে প্রোমোট করা ইত্যাদি এসব প্রতিষ্ঠানে ও কাজ করা হারাম। এমন কোথাও চাকরি করা যাবে না, যেখানে জুলুম ও হারামের পক্ষে সহযোগিতা করা হয়। যেমন:- সুদের কাজ, নৃত্যশালা, চলচ্চিত্রে কাজ করা ইত্যাদি।এ সকল ক্ষেত্রে চাকরিজীবী এ কথা বলে ছাড় পাবে না যে, সে নিজে তো হারাম কাজ করছে না। হারামের সহযোগিতা করাও হারাম। কিনৃতু হারাম জায়গায় চাকরি ব্যতীত যদি কোনো চাকরি একেবারে না পাওয়া যায় এবং জীবন চলার মতো অন্যকোনো অবলম্বন না থাকে তখন সেই কাজকে মনে মনে ঘৃণা রেখে করবে আর সাথে সাথে হালাল কোনো চাকরি খুঁজে নিবে। এ চেষ্টা অবিরত করতে হবে যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাকে হালাল কোনো চাকরির ব্যবস্থা করে দিবেন। মুসলমানদের সবসময় এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে যেসব কাজে কোনো ধরণের সন্দেহ থাকে অথবা ধর্মীয় বিশ্বাসকে দূর্বল করে দিবে। রাসূল (সা:) বলেন,

“যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তা ছেড়ে দাও; আর যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না, তা গ্রহণ কর।”

(সুনান তিরমিজি: ২৫১৮; নাসাঈ: ৫৭১১)

# পুরুষ ও নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতের বৈধ সীমা

**পুরুষের সতর** :- নাভীর উপরের ও হাটুঁর নিচের অংশ।
**মহিলার সতর**:-মুখমণ্ডল ও হাতের কবজি ছাড়া পুরো শরীর।
পুরুষের সতর ব্যতীত বাকি অংশ মহিলাদের জন্য দেখা হালাল, যদি না কোনো ধরণের কামনা বাসনার সম্ভাবনা না থাকে।তেমনিভাবে মহিলাদের মুখমন্ডল ও হাতের পাঞ্জাদ্বয় দেখা পুরুষের জন্য বৈধ যদি না তাতে কোনো কামনা বাসনা জাগ্রত হয়। অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর সতরবিহীন অঙ্গে তাকানো জায়েয। কিন্তু বারবার তাকানো ও তার দ্বারা নিজের কামনা বাসনা চরিতার্থ করা জায়েয নয়। কেননা তা যিনার দিকে টেনে নিয়ে যাবে। তবে যদি আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়ে যায় তাতে কোনো গুণাহ হবে না। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন,"তোমার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নাও। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আর তাকাবে না।"
তিনি আরও বলেন, " দৃষ্টির পর দৃষ্টি দিবে না। প্রথম দৃষ্টির জন্য তুমি ক্ষমাপ্রাপ্ত, দ্বিতীয়টির জন্যে নয়।"অর্থাৎ যে সকল অঙ্গের দিকে তাকানো হারাম বা সতরের অন্তর্ভুক্ত, কোনো প্রয়োজন ব্যতীত কোনো পুরুষ অপর পুরুষের, কোনো মহিলা অপর মহিলার সতরের দিকে দৃষ্টি দিবে না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তা দেখা বা স্পর্শ করা হালাল। যেমন:- চিকিৎসার সময়। সতরের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন কোনো অঙ্গ যদি কারো মনে ফিতনার উদ্রেক তৈরী করে, মনে কুচিন্তা আনে ও যৌন লালসার সৃষ্টি করে তখন ঐ সকল অঙ্গের দিকে তাকানোও হারাম।
একজন মহিলার সতরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত:-

- দৃষ্টি অবনত রাখা।
- পুরুষের সাথে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক এড়িয়ে চলা।
- তার পোশাক ইসলামী আদবের মধ্যে হতে হবে।

যার মধ্যে এই শর্তগুলো থাকবে-
(১) তা দ্বারা সমস্ত শরীর ঢেকে যাবে।
(২) পরিহিত পোশাক এত পাতলা হবে না যা দ্বারা ভেতরের সবকিছু বোঝা যাবে। আবার এত টাইট হবে না যা দ্বারা শরীরের সকল অঙ্গের আকৃতি বোঝা যাবে।
(৩) পুরুষের জন্য নির্ধারিত পোশাক মহিলারা পড়তে পারবেনা।
(৪) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর পোশাকের অনুরূপ পরিধান না করা।

- কথা বার্তায় চলাফেরায় গাম্ভীর্য থাকবে।চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গের লাস্যময়ী ভঙ্গি থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সুগন্ধি, আতর, বিভিন্ন সাজসজ্জা দ্বারা গোপন সৌন্দর্য পুরুষের সামনে তুলে ধরা যাবে না।

মোদ্দাকথা, ইসলাম মহিলাদের ঘরে বন্দি করে রাখেনি। তারা কবর ব্যতীত অন্য কোথাও যেতে পারবে না কথাটি একদম ই নিছক বানোয়াট। বরং নামাজ, জ্ঞান অর্জন, প্রয়োজনীয় কাজে, দুনিয়া -দ্বীনের সকল কাজের জন্য একজন মুসলিম নারীর বের হওয়ার অনএমতি দিয়েছে ইসলাম। এমনকি সাহাবীদের মধ্যে এমন কিছু নারী সাহাবী রয়েছেন যারা যুদ্ধের ময়দানে জিহাদ পর্যন্ত করেছেন।

সূরা আল-আহযাবের সূরা আল-আহযাবের এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা নারীদের পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। সাহাবিদের মধ্যে এক সময় আলোচনা হয় যে, নারীরা ঘরের বাইরে যেতে পারবে কি না। তখন এ প্রসঙ্গে নবী করিম (সাঃ) বলেন,
"আল্লাহ তোমাদেরকে (নারীদেরকে) প্রয়োজনীয় কাজের জন্য বাইরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।"
(সহীহ বুখারী: ৯৯৫; সহীহ মুসলিম: ২১৭০)

অর্থাৎ নারীদের ঘরের বাইরে যাওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ নয়,তবে তা শালীনতা, পর্দা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে এবং প্রয়োজনীয় কারণে হওয়া উচিত।যেমন:- বাজার করা, চিকিৎসা নেওয়া, আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ নেওয়া ইত্যাদি।

- **যিনাকে হারাম করা হয়েছে:-**

অতি কঠোর ভাষায় যিনাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং যিনা পর্যন্ত পৌঁছাতে যতগুলো ধাপ রয়েছে তার প্রত্যেকটিকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে, দুরে থাকতে বলা হয়েছে। ইসলাম যখন কোনো কিছু হারাম করে তখন সেটির দিকে যাওয়ার সকল সম্ভাবনার পথ ও বন্ধ করে দেয় এবং সে কাজের দিকে আকর্ষণকারী সকল কিছু হারাম করেছে।।যেমন:- ভিন্ন নারীর সাথে নির্জনে একাকী সাক্ষাৎ করা হারাম। এটা নিছক কোনো অবিশ্বাসের কারণে হারাম করা হয় নি।বরং নারী পুরুষ উভয়কে শয়তানের ওয়াসওয়াসা ও প্ররোচনা থেকে রক্ষা করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য । কেননা রাসূল (সা:) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন কোনো মহিলার সাথে নির্জনে সাক্ষাৎ না করে; কেননা তৃতীয়জন হয় শয়তান।"
(তিরমিজি: ২১৬৫, আহমদ: ১/১৮)
কোনো মহিলার সাথে একান্তই প্রয়োজনীয় আলাপ থাকলে তা কেমন হওয়া উচিত সেটাও কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,"আর তোমরা যখন নবীদের স্ত্রীদের কাছে কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও।-এটি তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের জন্য অধিক পবিত্র।"(সূরা আহযাব,আয়াত:৫৩)

মহিলাদের মাহরাম নয় এমন নিকটাত্মীয়দের সাথে একাকী অবস্থান করার ব্যাপারে রাসূল (সা:) সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন।
কেননা এটি এত বেশি সাধারণ ঘটনা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে। আর এটাই হলো leaking bucket এর উদাহরণ। অনেক মহিলাই আছেন,যারা মাশাল্লাহ প্রচুর নামাজ, রোজা পালন করছেন। কিন্তু বাড়ির ভেতরে পর্দা সম্পর্কে তাদের ধারণা থাকলেও তারা সেটি মানতে নারাজ। অনেকে হয়তো পরিবার বা স্বামীর সাপোর্টের কারণে মানতে পারছেননা। সেটা অন্য বিষয়। কিন্তু জেনে বুঝে মানছেন না এরকম নারীর সংখ্যা অগণিত।অথচ রাসূল (সাঃ) বলেছেন,
"দেবর তো মৃত্যু সমতুল্য।"

- **সাধারণ গোসলখানায় নারীর প্রবেশ:-**

মহিলাদের সতর ও সতীত্ব রক্ষার জন্য রাসূল (সা:) তাদেরকে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। এমনকি নারীরা নারীদের সামনে নিজেদের গায়ের পোশাক খুলতে নিষেধ করেছেন।পুরুষরাও লুঙ্গি বা গামছা না পরে সাধারণ গোসলখানায় প্রবেশ করতে পারবেনা। যাতে করে নিজের সতর অন্য পুরুষ দেখতে না পায়।

# বিবাহে হালাল-হারাম

ইসলাম যিনাকে হারাম করেছে আর বিয়েকে করেছে হালাল। ইসলাম বিয়ের দিকে আহ্বান করেছে, অবিবাহিত, চিরকুমার থাকা, নিজেকে নপুংসক করার পদ্ধতি ইসলাম সমর্থন করে না।সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিয়ে না করা ইসলাম একদমই সমর্থন করে না। যদিও তার উদ্দেশ্য থাকে, আল্লাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা, ইবাদাতের জন্য নিজেকে অবসরে রাখা ও দুনিয়ামুখী না হওয়া। রাসূল(সা:) এর সময়ে কিছু সাহাবীর মধ্যে এরকম দুনিয়াবিমুখ প্রবণতা চলে আসলে তিনি ঘোষণা দিলেন, "দুনিয়াবিমুখতার অর্থ হল ইসলাম ও রাসূলের (সা:) সুন্নাতের প্রতি অগ্রাহ্য করা। এটি হলো খ্রিস্টানদের প্রবণতা। এই প্রবণতাকে তিনি ইসলামবিরোধী হিসেবে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেছেন,
"হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য আল্লাহ যা হালাল করেছেন, সেই উত্তম বস্তুসমূহ তোমরা হারাম করো না এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"(সূরা মায়িদা,আয়াত:৮৭)

যে ব্যাক্তি বিয়ে না করলে পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকে তার জন্য বিয়ে করা আবশ্যক।কেননা, রাসূল (সা:) বলেছেন,
"তিন ব্যক্তির সাহায্য করা আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে
(১) সে ব্যক্তি যে নিজ চরিত্র রক্ষার জন্য বিবাহ করে,
(২)সে ব্যক্তি যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে (জিহাদ),
(৩)এবং সে ব্যক্তি যে কোনো মুক্তিপত্রের (চুক্তিপত্রের) মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করে।"-(সুনান আত-তিরমিজি: ১৬৫৫,সুনান ইবন মাজাহ :২৫১৮)

- **যে সকল নারীকে বিয়ে করা হারাম :-**
  (১)পিতার স্ত্রী
  (২)মা - দাদী, নানী ও এর আওতায় পড়ে।
  (৩)ভাগ্নী- মায়ের বা পিতার দিক থেকে
  (৪)কন্যা-পুত্রের বা মেয়ের কন্যাও পড়ে।
  (৫)ফুফু- পিতার মা বাবা যে দিকেই হোক।
  (৬)খালা
  (৭)ভাইয়ের কন্যা
  (৮)বোনের কন্যা

(৯)দুধমাতা
(১০)দুধবোন
(১১)স্ত্রীর মা
(১২)স্ত্রীর মেয়ে
(১৩)স্বীয় পুত্রের স্ত্রীগণ
(১৪)২বোনকে একত্রে বিয়ে করা।
(১৫) ঐমহিলা বিয়ে করা হারাম যারা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহে আবদ্ধ।
(১৬) মুশরিক মহিলা।
(১৭) ব্যভিচারিণী নারী।

- **আহলে কিতাবীদের বিয়ে করা:-**

ইসলাম মুসলমানদেরকে আহলে কিতাবী নারীদের বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। যেমনিভাবে তাদের জবাইকৃত পশুর গোস্ত খাওয়া হালাল তেমনিভাবে তাদের মেয়েদের বিয়ে করাও হালাল।আল্লাহ তাআলা বলেন, "যাদেরকে কিতাব (তাওরাত ও ইঞ্জিল) দেয়া হয়েছে, তাদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল, এবং তোমাদের খাদ্যও তাদের জন্য হালাল।আর মুমিনদের মধ্যে সতী-সাধ্বী নারী এবং তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবপ্রাপ্তদের সতী-সাধ্বী নারীগণও তোমাদের জন্য হালাল। যদি তোমরা তাদের মোহরানা প্রদান করো, সৎভাবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচার বা গোপন সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে নয়।"(সূরা মায়িদা,আয়াত:৫)

কিন্তু মুসলিম নারীদেরকে আহলে কিতাবী পুরুষের কাছে বিয়ে দেয়ার অনুমতি দেয়নি।কেননা, কুরআনে বলা হয়েছে,"তোমরা মুশরিক (অবিশ্বাসী) নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।একজন ঈমানদার দাসী একজন মুশরিক নারীর চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়।এবং তোমরা তোমাদের নারীদের মুশরিক পুরুষদের সাথে বিবাহ দিও না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে।একজন ঈমানদার দাস একজন মুশরিকের চেয়ে উত্তম, যদিও সে তোমাদের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়।তারা আহ্বান করে জাহান্নামের দিকে, আর আল্লাহ আহ্বান করেন জান্নাত ও ক্ষমার দিকে -তাঁর নির্দেশে এবং আল্লাহ মানুষকে তাঁর নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।"-(সূরা বাকারা,আয়াত:২২১)

- **বিয়ের প্রস্তাব সম্পর্কিত হারাম:-**

কোনো মুসলমান বিয়ে করার নিয়তে কোনো মেয়ের জন্য প্রস্তাব দিলে প্রস্তাবকারী বিয়ের অনুষ্ঠানের পূর্বে ঐ মেয়েকে দেখতে পারবে। কেননা চোখ হচ্ছে অন্তরের বার্তাবাহক। হাদীসে এসেছে, "তোমাদের কেউ যদি কোনো নারীকে বিবাহের জন্য প্রস্তাব দেয়, তবে যদি সে তার মধ্যে এমন কিছু দেখতে পারে যা তাকে বিয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলে, তবে সে যেন তা দেখে।"(সুনান আবু দাউদ:২০৮২,সুনান ইবন মাজাহ: ১৮৬৫)

বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করতে বলেছেন। মাহরাম পুরুষের সামনে একজন মহিলা যতটুকু প্রদর্শন করতে পারেন ততটুকু প্রস্তাবকারী পুরুষ দেখতে পারবেন। কনের বুদ্ধিমত্তা দেখার জন্য নির্জন জায়গায় ও বসতে পারেন যেখানে মেয়ে স্বাভাবিক চলাফেরা করতে পারে। তবে শর্ত হল, জায়গাটি অবশ্যই শরীয়াতসম্মত হতে

হবে। প্রস্তাবকারী মেয়েকে ও মেয়ের পরিবারকে জানিয়ে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখতে পারবে কিংবা যদি ইচ্ছে করে আড়াল থেকেও দেখতে পারবপ তবে তাতে বিয়ের পূর্ণ নিয়ত থাকতে হবে।

কোনো মুসলমানের জন্য এমন কোনো নারীকে প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়, যে তালাকপ্রাপ্ত হয়েছে বা যার স্বামী মারা গেছে কিন্তু তার এখনো ইদ্দত পালন শেষ হয়নি। তবে সে ইশারা-ইঙ্গিতে ঐ মহিলাকে বোঝাতে পারবে যে সে তাকে বিয়ে করতে আগ্রহী, কিন্তু প্রকাশ্য প্রস্তাব দিতে পারবে না। তাছাড়া কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয় এমন কোথাও প্রস্তাব দেয়া যেখানে তার অপর মুসলমান ভাই প্রস্তাব দিয়েছে। যদি প্রস্তাবটির দিকে উভয় পক্ষ এগিয়ে যেতে থাকে।কিন্তু প্রস্তাবকারী নিজেই যদি সেই প্রস্তাব নাকচ করে দেয় অথবা মেয়েদের পক্ষ থেকে যদি নতুন প্রস্তাব দেয়ার অনুমতি দেয় তাহলে দ্বিতীয় প্রস্তাব দিতে কোনো সমস্যা নেই। রাসূল (সা:) বলেছেন, " এক মুমিন অপর মুমিনের ভাই। কাজেই কোনো মুমিন তার ভাইয়ের ক্রয়ের ওপর ক্রয় করা এবং প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব দেয়া বৈধ নয়।"
-( সহীহ মুসলিম: ১৪১২, সহীহ বুখারী:৫১৪২)

- **কুমারী মেয়ের অনুমতি ও তাকে জোর না করা:-**

ইসলাে ম কুমারী মেয়ের মতের গুরুত্ব না দিয়ে তার সম্মতি ব্যতীত বিয়ের কথা পাকা করা কোনোভাবেই তার পিতামাতার জন্য বৈধ নয়। রাসূল (সা:) বলেন,
"যে মেয়ের পূর্বে কোনো স্বামী ছিল (অর্থাৎ, বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা নারী), সে নিজের ব্যাপারে (বিয়ে সংক্রান্ত সিদ্ধান্তে) তার অভিভাবকের চেয়ে বেশি অধিকারী। আর কুমারী মেয়ের বিয়েতে অবশ্যই তার অনুমতি নিতে হবে; তার নীরবতাই তার অনুমতি হিসেবে গণ্য হবে।"
(সহীহ বুখারী: ৫১৩৬, সহীহ মুসলিম: ১৪১৯)
মেয়ের জন্য দ্বীনদার ও চরিত্রবান পাত্রের পক্ষ থেকে প্রস্তাব আসলে তার বিয়ে বিলম্বিত করার অধিকার তার পিতার নেই।রাসূল (সা:) বলেন, "তিনটি ব্যাপার বিলম্বিত করা উচিত নয়ঃ নামাজের সময় যখন উপস্থিত হয়, জানাজা যখন উপস্থিত হয় ,কোনো অবিবাহিতা (অর্থাৎ বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা) নারী যখন উপযুক্ত প্রার্থী পায় — তখন।"
(জামেআত-তিরমিজি:১৭১,মুসনাদেআহমদ:২৩৪৬৪)

- **সাময়িক বিয়ে করা হারাম:-**

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট মজুরীতে কোনো মহিলার সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে সাময়িক বিয়ে হিসেবে গণ্য করা হয়। ইসলামের একদম শুরুতে এরকম একটি বিধান কার্যকর ছিল। কেননা, তখন কেবল মানুষ জাহেলিয়াত ছেড়ে ইসলামে প্রবেশ করছিল। কিন্তু যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করল, তখন যুদ্ধে ও সফরে দূর্বল ঈমানের অধিকারীদের জন্য যিনার দিকে ধাবিত হয়ে পড়ার তীব্র আশংকা দেখা দেয়। অন্যদিকে যারা ঈমানের দিক থেকে শক্তিশালী তারা ভাবলেন নিজেদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে যৌনশক্তি অক্ষম করে ফেলবেন। যার কারণে দূর্বল ও শক্তিশালী ঈমানদাররা ও মহাসমস্যায় পড়ে গেলেন। তাদের কথা চিন্তা করে সাময়িক বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়। যাতে করে মানুষ যিনা-ব্যভিচারের পথ ছেড়ে ধীরে ধীরে

হালাল বৈবাহিক জীবনে অভ্যস্ত হয়। যেমনিভাবে কুরআনে সুদ ও মদ হারাম করার ক্ষেত্রে ক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে, কেননা এটি জাহেলিয়াত যুগে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল, হঠাৎ করে হারাম করে দিলে অনেক ঈমানদারের জন্য এটি কঠিন হয়ে পড়ছিল।তাই, সাময়িক বিয়ের ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে ক্রমিক পদ্ধতি অবলম্বন করে সাময়িক বিয়েকে হারাম করা হয়েছে। এখন, আধুনিক সমাজে মানুষ অপ্রয়োজনে ও এই ব্যবস্থার অপব্যবহার করতে শুরু করেছে। স্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা দেয়ার পরেও মানুষ চার বিয়ের সুন্নাতের আড়ালে হালাল পতিতালয় এর মতো concept গড়ে তুলেছে ইসলামের নামে। মোটেও আমাদের ধর্ম এটা সমর্থন করে না। চার বিয়ে অবশ্যই সুন্নাত যদি তিনি সমতাবিধান করতে পারেন শরীয়ত অনুযায়ী, কিন্তু এই সুন্নাতকে পুঁজি করে ইসলামী লেবাস ধারণ করা কিছু মানুষই সাময়িক বিয়েকে promote করে চলেছেন। এবং এটি সম্পূর্ণভাবে হারাম।

- **একাধিক স্ত্রী গ্রহণের শর্ত:-**

এই ব্যাপারে ইসলাম যে শর্ত দিয়েছে তা হল,
স্বামী তার স্ত্রীদের মধ্যে সবকিছুতেই সমতাবিধান প্রতিষ্ঠিত করবেন। যে ব্যক্তি সমতাবিধান করতে পারবেননা তার জন্যে একাধিক বিয়ে করা হারাম।কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,
“তোমরা নারীদের মধ্যে যাদের পছন্দ কর তাদের সাথে বিবাহ কর— দু’টি, তিনটি বা চারটি।কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে একটিই (বিয়ে করো)।অথবা (যা) তোমাদের অধিকারভুক্ত।এটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত, যাতে তোমরা কষ্টে না পড়ো।”
(সূরা নিসা,আয়াত:৩)তবে অন্তরে কাউকে অধিক ভালোবাসা বা কম ভালোবাসা মানুষের সাধ্যে থাকে না। আল্লাহ তাআলা এ ব্যাপারে ক্ষমা করে দিয়েছেন।আল্লাহ তাআলা বলেন,
“তোমরা যতই চেষ্টা কর না কেন, স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি ন্যায়বিচার করতে কখনোই পারবে না। কিন্তু তোমরা একদমই একদিকের দিকে ঝুঁকে পড়ো না— যাতে অন্য স্ত্রীটি ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে থাকে (অর্থাৎ না স্বামী-সংসারের সুখ পায়, না তালাক পায়)।আর যদি তোমরা সংশোধন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর, তবে আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমাশীল, দয়ালু।”
(সূরা নিসা, আয়াত:১২৯)
রাসূল (সা:) তাঁর স্ত্রীদের মাঝে সমান ভাগে ইনসাফের সাথে ভাগ করে বলতেন - “হে আল্লাহ!এটা আমার পক্ষ থেকে (স্ত্রীদের মধ্যে) যা আমি ক্ষমতার মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারি-তা আমি করলাম।অতএব এমন বিষয়ে আমাকে পাকড়াও করো না, যা তোমার নিয়ন্ত্রণে, আর আমার নিয়ন্ত্রণে নেই।”

- **স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কে হালাল-হারাম:-**

**হায়েয অবস্থায়:-**

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারা তোমার কাছে রজঃস্রাব (মাসিক) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল,এটি অস্বস্তিকর (কষ্টদায়ক ও অশুচি অবস্থা)। অতএব, মাসিক অবস্থায় তোমরা স্ত্রীদের থেকে দূরে থাকো এবং তাদের সাথে সহবাসের নিকটবর্তীও হয়ো না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়। আর যখন তারা পবিত্র হয়ে গোসল করবে, তখন আল্লাহ তোমাদেরকে যে পথ নির্দেশ করেছেন সেভাবে তাদের কাছে যাও।নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা করতে ভালোবাসেন এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরও ভালোবাসেন।"(সূরা বাকারা, আয়াত:২২২)

**গুহ্যদারে সহবাস পরিহার :-**

গুহ্যদারে সহবাসকে হারাম বলা হয়েছে। কেননা,রাসূল(সা:) বলেছেন, " তোমরা মহিলাদের পায়ুপথে সঙ্গম করো না। "রাসূল (সা:) বলেছেন:

"যে ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে পায়ুপথে সহবাস করে, সে অভিশপ্ত।"(সুনান আবু দাউদ, তিরমিজি)

তিনি আরও বলেছেন:"যে তার স্ত্রীর কাছে পায়ুপথে সহবাস করে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন।" (মুসনাদ আহমদ)

অর্থাৎ এ কাজ খুবই জঘন্য—ইসলাম এটিকে নিষিদ্ধ করেছে কারণ—এটি স্বাভাবিক পথ নয়,শরীরের জন্য খুবই ক্ষতিকর,বিভিন্ন ধরণের মারাত্মক রোগ ছড়ানোর সম্ভাবনা (fistula, anal fissure, piles) ক্ষত, ব্যথা ও দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা তৈরি করে।

এটি অশ্লীলতার ঘৃণ্যতম রূপ।

**স্বামী স্ত্রীর গোপনীয়তা সংরক্ষণ** :-

স্বামী স্ত্রী গোপনে যা করে থাকে তা বন্ধু বান্ধবের সাথে খোশ-গল্পে মজার ছলেও বলা জায়েয নয়। স্বামী–স্ত্রীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সম্পূর্ণ গোপনীয়।মিলনের সময় যা ঘটে, যে কথা হয়, যে দুর্বলতা বা ব্যক্তিগত অনুভূতি থাকে এগুলো কাউকে বলা হারাম।কারো সামনে গল্প করা, বন্ধুদের বলতে যাওয়া, হাসাহাসি করা—সবই গুনাহে কবীরা। এটি স্ত্রীর ইজ্জত ও পর্দার বড় লঙ্ঘন,দাম্পত্য পবিত্রতার বিরুদ্ধে,সমাজে অশ্লীলতা ছড়ায় এবং সর্বোপরি দাম্পত্য সম্পর্কে বিশ্বাস ভেঙে যায়।রাসূল (সা:)বলেছেন:

"নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট অবস্থায় থাকবে সেই ব্যক্তি—
যে স্ত্রীসহ মিলন করে এবং স্ত্রীও তার সাথে মিলন করে;তারপর সে (পুরুষ) গিয়ে তাদের গোপন ব্যাপার ও কথাগুলো মানুষের সামনে প্রকাশ করে।"
— (সহীহ মুসলিম)

## পরিবার পরিকল্পনা :-

ইসলামে পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning) বৈধ কিন্তু কিছু শর্তের সাথে। এটি হারাম নয়, বরং সাহাবায়ে কেরাম নিজেরাও বিভিন্নভাবে জন্মবিরতি (Birth control) করেছেন এবং রাসূল তা নিষেধ করেননি।রাসূল (সাঃ) এর সময়েই সাহাবীরা আযল করতেন। এতে তিনি নিষেধ করেননি। শর্তগুলো হল-

(১)সন্তান জন্মদানে মায়ের মৃত্যুর শঙ্কা থাকলে।

(২)দুনিয়াবী সমস্যায় পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে, হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার আশংকা থাকলে।

(৩) সন্তান পালন ও মানসিক স্থিতি বজায় রাখা

এবং অতিদ্রুত পরপর গর্ভধারণের ঝুঁকি এড়ানো।

ইসলামের দৃষ্টিতে, দুই সন্তানের মাঝে ত্রিশ বা তেত্রিশ মাস ব্যবধান থাকা উচিত। এটি হলো বাচ্চার দুগ্ধপানের পূর্ণ সময়। জন্মনিরোধক হিসেবে অস্থায়ী পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, নিজের শরীরের জন্য ক্ষতিকর বস্তু নেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। এসব জন্মনিরোধক পিল, বড়ি বা কপারটি এগুলোর অনেক side effect থাকে। তাই, জন্মনিরোধক নেয়ার আগে নিজের শরীরের জন্য কোনটা ভালো সেটা বুঝেই নেয়া উচিত।

## গর্ভপাত হারাম প্রসঙ্গে :

ইসলামে গর্ভপাত হারাম। যদিও এ গর্ভধারণ হারাম মেলামেশার কারণে ও হয়ে থাকে। কেননা রাসূল (সাঃ) কোনো গর্ভবতী মহিলার ওপরে হদ (যিনার শাস্তি) প্রয়োগ করতেন না যতদিন না সে সন্তান প্রসব করে এবং দুগ্ধপানের সময়সীমা পার না করে।

হাদিস অনুযায়ী: ১২০ দিন পর আল্লাহ নবজাতকের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেন।তাই এই সময়ের পর গর্ভপাত করা হলো একটি প্রাণ হত্যা,এবং এটিকে গুরুতর গুনাহ বলা হয়েছে।

**গর্ভপাত কখন বৈধ?** (শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় অবস্থায়)

( ১) মায়ের জীবন নিশ্চিত ঝুঁকিতে পড়ে

( ২)মায়ের গুরুতর শারীরিক/মানসিক রোগ

(৩)ভ্রূণের মারাত্মক জন্মগত ত্রুটি (incompatible with life)যেমন:জন্মেই মারা যাবে,মস্তিষ্ক না থাকা (anencephaly),হার্ট বা কিডনি ছাড়া তৈরি হওয়া,

এ অবস্থায় ১২০ দিনের আগে গর্ভপাত অনেক আলেমের মতে বৈধ। মায়ের নিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি থাকলে ১২০ দিন পরেও গর্ভপাত বৈধ।

**গর্ভপাত যেসব কারণে হারাম:-**

(১)দারিদ্র্যের ভয়

(২)সন্তান বেশি হয়ে গেছে মনে হওয়া

(৩)পরিবার পরিকল্পনার জন্য

(৪)ছেলে না হয়ে মেয়ে হয়েছে (gender selection)

(৫)শিক্ষাজীবন / ক্যারিয়ার / সামাজিক লজ্জার ভয়

এসব কারণে গর্ভপাত পুরোপুরি হারাম।

# তালাক

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,
“তারা(স্ত্রীরা) তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের পোশাক।”(সূরা বাকারা, আয়াত:১৮৭)
স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের ওপর অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর নারীদের জন্য রয়েছে স্বাভাবিকভাবে যেসব অধিকার।সেই একইরূপ দায়িত্বও তাদের ওপর আছে।তবে পুরুষদের নারীদের উপর (দায়িত্ব ও নেতৃত্বের) মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ মহাশক্তিমান, মহাপ্রজ্ঞাবান।"
-(সূরা বাকারা, আয়াত:২২৮)
পুরুষের সেই মর্যাদা হলো পরিচালনা, দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতায় তার কর্তৃত্ব। কোনো মুসলমানের জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে তার স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যাপারে বেখেয়ালি হয়ে থাকবপ অথবা উপেক্ষা করে চলবে।হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন: “একজন মানুষের জন্য এটাই যথেষ্ট গুনাহ যে, যাদের ভরণ-পোষণ তার উপর ওয়াজিব, তাদের ব্যাপারে সে উদাসীন থাকে।”
( আবু দাউদ, মুসনাদে আহমদ)

**ইসলামে যাদের দায়িত্ব একজন পুরুষের ওপর থাকে:**স্ত্রী,সন্তান,বাবা-মা (যদি তারা অক্ষম হন)
নিজের অধীনে থাকা অন্যান্য পরিবার সদস্য যাদের প্রয়োজন পূরণ করা তার দায়িত্ব।ভরণ-পোষণ মানে শুধু খাবার নয়। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত- খাবার, পোশাক, নিরাপদ বাসস্থান,চিকিৎসা,প্রয়োজনীয় শিক্ষা,তাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা।এটি মানুষের উপর আল্লাহর দেয়া ফরজ দায়িত্ব।এ দায়িত্ব অবহেলা করলে সমাজে অন্যায়, কষ্ট, অবহেলা, দারিদ্র্য সব সৃষ্টি হয়,পরিবার ভেঙে যায়, স্ত্রী-সন্তান কষ্টে পড়ে।
তাই এর শাস্তি বড় গুনাহের স্তরে পৌঁছে যায়।
রাসূল (সাঃ) বলেছেন,“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের জন্য উত্তম।” অর্থাৎ—পরিবারের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়া ইবাদতও, নেক আমলও।

**স্ত্রীর অবাধ্যতা ও তার সাথে বিরোধ অবস্থায়:**স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের ত্রুটিতে সর্বোচ্চ ধৈর্য্য ধারণ করবে। কেননা কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য বৈধ নয় যে, তোমরা নারীদের জোর করে উত্তরাধিকারসূত্রে (নিজ অধিকারে) গ্রহণ করবে।তোমরা তাদেরকে কষ্ট দেবে না—যাতে তোমরা তাদেরকে দেয়া মোহরের কিছু অংশ নিয়ে নিতে পারো। যদি না তারা স্পষ্ট অশ্লীলতার কাজে লিপ্ত হয়।আর তোমরা তাদের সঙ্গে উত্তমভাবে বসবাস করবে। আর যদি তোমরা তাদের অপছন্দও করো। তবুও হতে পারে, তোমরা কোনো জিনিস অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রেখেছেন।”(সূরা নিসা,আয়াত:১৯)

কোনো স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়, তার স্বামীর আনুগত্য ত্যাগ করে অবাধ্য হওয়া। স্বামী যখন লক্ষ্য করবে তার স্ত্রী অবাধ্য হচ্ছে, তখন তার উচিত হবে তাকে ভাল উপদেশ ও যুক্তিযুক্ত, হৃদয়গ্রাহী কথা বলে সাধ্যমত তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা। এরপর ও না বোঝাতে পারলে, তার শয্যা পরিহার করবে, তারপর ও যদি তার স্ত্রী অবাধ্য আচরণ করেন, তখন তাকে আদবের জন্য হালকা প্রহার করবেন।
একজন পুরুষের জন্য এটা কখনই বৈধ নয় যে, সে তার স্ত্রীর চেহারায় আঘাত করবে কেননা, এতে মানুষের সম্মান নষ্ট হয়। স্ত্রী যদি অন্যায় আচরণ করেন তাকে প্রহার করা বৈধ হলেও এমনভাবে প্রহার করা যাবে না যা তাকে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলবে অথবা মৃত্যুর দিকে টেনে নিবে। কোনো মুসলমান পুরুষ তার স্ত্রীকে গালাগালি করা বা কথা দ্বারা কষ্ট দেয়া একদমই বৈধ নয়। এমনকি তাকে বদদোয়াও করা উচিত নয়। হাদীসে আছে-
“আল্লাহ ও পরকাল দিবসে বিশ্বাসী কোনো নারীর জন্য বৈধ নয় যে,সে তার ঘরে এমন কাউকে প্রবেশ করতে দেবে যাকে তার স্বামী অপছন্দ করে;
এবং তার স্বামী অপছন্দ করলে সে (স্ত্রী) ঘর থেকে বের হবে না।”( সহীহ বুখারী:৫০৯৫)
কিন্তু এসকল ব্যবস্থা গ্রহণে যদি কোনো উপকার না হয় এবং উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের আশংকা দেখা দেয় তাহলে ইসলামী সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এবং স্বামী স্ত্রী ২জনের পক্ষ থেকে কল্যাণকামী লোকজন তাতে হস্তক্ষেপ করবে। তারা স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব মেটানোর চেষ্টা করবে। যদি না মেটানোই যায়, তাদের মধ্যে সম্পর্কছেদ হওয়ার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন স্বামীর পরিবার থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন নিয়ে সালিস করা হবে। তারা মীমাংসা চাইলে আল্লাহ তাআলা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। সব চেষ্টা বিফল হয়ে গেলে সর্বশেষ উপায় হিসেবে শরীয়তসম্মত পন্থা অবলম্বন করে তালাক দেয়া স্বামীর জন্য বৈধ। এটি ইসলামে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বৈধ কাজ। রাসূল (সাঃ) বলেন,
“ আল্লাহ তাআলার নিকট হালাল কাজ সমূহের মধ্যে সর্বাধিক ঘৃণিত কাজ হলো তালাক দেয়া।”
-(সুনানে ইবনে মাজাহ,২০১৮)

**তালাকের ক্ষেত্রে ইসলামের সীমাবদ্ধতা:-**
(১)<u>মাসিক চলাকালীন সময়ে তালাক দেয়া হারাম।</u> হাদীসে বর্ণিত আছে, আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা:) হায়েয অবস্থায় তার স্ত্রীকে তালাক দেন। ওমর(রা:) এ ব্যাপারে রাসূল (সা:) কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, “তাকে বল তার স্ত্রী কে ফিরিয়ে আনতে এবং এরপর যদি সে চায় তবে পবিত্র অবস্থায় সহবাস না করেই যেনো তালাক দেয়।”(সহীহ বুখারী:৫২৫১)
(২)<u>তালাকের শপথ করা হারাম:-</u>
কোনো কাজ করলে বা না করলে “তালাক হয়ে যাবে” এরূপ শর্ত জুড়ে দেয়া বৈধ নয়। শপথ হওয়া উচিত আল্লাহর নামে।
(৩)<u>তালাকপ্রাপ্ত নারী স্বামীর ঘরে ইদ্দত পালন করবে।</u> যদি স্বামী স্ত্রী কে এক বা দুই তালাক দেয় তার ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য। যিনি একত্রেই তিন তালাক দিয়ে ফেলেছেন তার জন্য নয়। কেননা ইদ্দতের মধ্যে স্ত্রী যখন স্বামীর কাছে থাকেন তার সহানুভূতি জাগতে পারে, ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই বিষয়টি পুনরায় বিবেচনা করতে পারেন। এ সময় মানুষের মনের অবস্থা

পরিবর্তিত হয়, নতুন চিন্তা ভাবনার উদয় হয়, ক্রোধ সন্তুষ্টিতে পরিণত হয়।আল্লাহ তাআলা কুরআনে বলেন, “হে নবী! যখন তোমরা নারীদের তালাক দেবে,তখন তাদের 'ইদ্দত' শুরু হয়।এমন অবস্থায় তালাক দেবে এবং তোমরা ইদ্দত গণনা করবে।আর তোমরা তোমাদের প্রভু আল্লাহকে ভয় করো।তোমরা তাদেরকে তাদের বাসা থেকে বের করো না এবং তারাও যেন তাদের বাসা ছেড়ে না যায়, যদি না তারা প্রকাশ্য কোনো অশ্লীল কাজ করে।

এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ।আর কেউ আল্লাহর সীমা লঙঘন করলে সে নিজের ওপর জুলুম করল।তুমি তো জানো না,সম্ভবত আল্লাহ এর পর কোনো নতুন পরিস্থিতি (মিলনের পথ) সৃষ্টি করে দেবেন।”-(সূরা তালাক, আয়াত:১)

(৪) <u>এক তালাকের পর আরেক তালাক দেয়া:-</u>

ইসলামে বলা হয়েছে তিনবারে তিন তালাক দিতে। যে পবিত্র অবস্থায় সহবাস করে নি, সে তখন এক তালাক দিবে এবং স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে। ইদ্দত অবস্থায় স্বামী যদি চায় তাকে রেখে দিবে, তাকে সহজভাবেই ফিরিয়ে নিতে পারবে। যদি ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বেই ইদ্দত শেষ হয়ে যায় তাহলে পুনরায় নতুন বিয়ে করে ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর না চাইলে স্ত্রী নতুন স্বামী গ্রহণ করতে পারবে।

দ্বিতীয়বার যদি আবার তাদের মধ্যে ঝগড়া হয়, সকল ব্যবস্থার পরেও ঝামেলা মিটমাট না হয়, স্বানী আবার তাকে তালাক দিতে পারবেন। ঠিক আগের পদ্ধতিতেই তিনি তার স্ত্রী কে ফিরিয়ে নিতে পারবেন। যদি স্বামীর মনের পরিবর্তন হয়।

কিন্তু এরপর যদি স্বামী স্ত্রী কে তৃতীয় তালাক দেয়, তাহলে স্ত্রী কে আর ফেরানো যাবে না। তালাক হয়ে যাবে। যতক্ষণ না কোনো দ্বিতীয় ব্যক্তি স্ত্রী কে বিয়ে করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবেননা। দ্বিতীয় বিয়ে শরয়ী পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ হতে হবে। শুধু প্রথম স্বামীর জন্যে হালাল করার উদ্দেশ্যে হলে হবে না।সহীহ হাদিসে বর্ণিত আছে, যখন রাসূল (সা:) শুনলেন এক ব্যক্তি তার স্ত্রী কে একত্রে তিন তালাক দিয়েছেন, তখন রাসূল (সা:) রাগে দাঁড়িয়ে গেলেন, আর বললেন, “আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকতেই এ লোকটি আল্লাহর কিতাব নিয়ে খেল-তামাশা করছে?

-(সুনানে আন নাসায়ী, ৩৪০১)

<u>(৫)ইদ্দতের সময় দীর্ঘ করা যাবে না:-</u>

জাহেলিয়াত যুগে লোকেরা ইচ্ছে করে ইদ্দতের সময় দীর্ঘ করে নারীদের কষ্ট দিত, দীর্ঘ সময় দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখার জন্য ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার পূর্বে তাকে ফিরিয়ে নিত। স্ত্রী কে এরূপ কষ্ট দেয়া কুরআনে আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। তিনি বলেন,

“তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে এবং তারা তাদের ইদ্দত পূর্ণ করতে থাকবে,
তখন তোমরা তাদেরকে ভালোভাবে রেখে দিবে, অথবা ভালোভাবে ছেড়ে দিবে।
তোমরা তাদেরকে ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ধরে রেখো না, যাতে তাদের ওপর জুলুম করতে পারো।

আর যে এমন করবে সে নিজের ওপরই জুলুম করল।আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে হাসি-তামাশার বিষয় বানিও না।এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহ যে নেয়ামত

দান করেছেন এবং যে কিতাব ও হিকমত তোমাদের উপর নাযিল করেছেন—তা স্মরণ কর, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন।আল্লাহকে ভয় কর; এবং জেনে রেখো, নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু সম্পর্কে অবগত।"
(সূরা বাকারা, আয়াত:২৩১)
(৬)তালাকপ্রাপ্ত নারীকে পছন্দসই বিয়ে করতে বাধা দেয়া উচিত নয়।ইদ্দত পূর্ণ হলে সে যাকে চাইবে তার সাথে বিয়ে করতে তার স্বজন বা পূর্ব স্বামী কিংবা অন্য কেউ বাধা দেয়া বৈধ নয়। শরীয়ত এবং সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী পরস্পরের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে প্রস্তাব দেয়া হলে তাতে কারো বাধা দেয়ার অধিকার নেই।
(৭)স্বামীকে তালাক দেয়ার অনুমতি দিয়েছে ইসলাম।
যখন কোনো নারী তার স্বামীকে অপছন্দ করতে থাকে এবং তার সাথে সংসার করা অসম্ভব মনে করে, মোহরানা, উপহার বা তার চেয়ে কম বেশি বিনিময়ের মাধ্যমে উভয়ের সম্মতিতে নিজের ঐ স্বামী থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।এ অধিকার তাকে দিয়েছে ইসলাম। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, " তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে
তারা আল্লাহর সীমাবদ্ধতা রক্ষা করতে পারবে না,
তাহলে স্ত্রী যদি স্বামীর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু ফেরত দেয়—তাতে উভয়েরই কোনো গুনাহ নেই।"-(সূরা বাকারা, আয়াত:২২৯)
তবে কোনো অসুবিধা না থাকলে স্বামীর কাছ থেকে তালাক নেয়ার জন্য তাড়াতাড়ি করা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। উভয়ের মাঝে বিচ্ছেদের জন্য গ্রহণযোগ্য কারণ থাকতে হবে। রাসূল (সা:) বলেন,
"যে নারী কোনো কারণ ছাড়াই নিজ স্বামীর নিকট তালাক চাইবে, তার জন্যে জান্নাতের সুগন্ধি ও হারাম।"-(সূনানে আবু দাউদ, ২২২৬)
(৮) স্ত্রী ত্যাগের শপথ করা হারাম। স্বামী যদি রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীর বিছানা ত্যাগ করে, এত দীর্ঘ সময় ত্যাগ করে যা সহ্য করা স্ত্রীর জন্য অতীব কষ্টকর, এমনটা করা ইসলামে হারাম বলা হয়েছে। কেউ যদি শপথ করে ফেলে, আমি আর কখনও তার সাথে সহবাস করবো না, তখন শরীয়ত মতে তাকে চার মাসের সুযোগ দেয়া হবে। হয়তো এই সময় তার ক্রোধ পূরশমিত হবে, তার মনের পরিবর্তন হবে, সহানুভূতিশীল হবে স্ত্রীর প্রতি। যদি চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে সে তার শপথ ভঙ্গ করে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার পাপ ক্ষমা করে দিবেন এবং তার জন্য তাওবার দরজা খুলে দিবেন। সাথে সাথে কসমের কাফফারাও তার ওপর ওয়াজিব হবে। এ সময়সীমা অতিক্রমের পর তার মধ্যে যদি সংশোধন না আসে, তাহলে স্ত্রীর সাথে তার তালাক হয়ে যাবে।
স্ত্রীর নিকট না যাওয়া নিয়ে করা এই শপথকে শরীয়াতের ভাষায় **ইলা** বলে।এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, "যারা তাদের স্ত্রীদের থেকে (সহবাস বর্জনের) ইলা করে,তাদের জন্য অপেক্ষার মেয়াদ হলো চার মাস। এরপর যদি তারা ফিরে আসে (অর্থাৎ স্ত্রীদের সাথে মিলিত হতে চায়), তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।আর যদি তারা (চার মাস পর) তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়,তবে নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"-(সূরা বাকারা, আয়াত :২২৬-২৭)

নারীর জন্য চার মাস স্বামীহীনা অবস্থায় ধৈর্যধারণ করে থাকা সম্ভব। এক রাতে হযরত উমর (রাঃ) মদিনার রাস্তায় টহল দিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি একটি ঘরের ভেতর থেকে একজন মহিলার কবিতার মতো কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন।মহিলা একা, স্বামী জিহাদে।
তার অভাব–বেদনা প্রকাশ করে বলছিল—
"দীর্ঘ রাতগুলো কেমন করে কাটাই?
স্বামী দূরে যুদ্ধ করছে,
আমার নফস আমাকে টানে,
যদি আল্লাহকে ভয় না করতাম
আমি নিজের নফসকে বশে রাখতে পারতাম না।"
এই কথাগুলো শুনে উমর (রাঃ) গভীরভাবে কেঁদে ফেলেন।তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটি বুঝলেন, নারীরা স্বামীদের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে কষ্টে থাকে এবং এটি তাদের অধিকার ও ঈমান দুটোই কঠিন পরীক্ষায় ফেলে।উমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে এক নারীকে (কোনো মহিলা সাহাবিয়া বা কর্মী) পাঠালেন মহিলার কাছে।
তিনি জানতে চাইলেন:"একজন নারী কতদিন স্বামীর অনুপস্থিতি ধৈর্য ধরে সহ্য করতে পারে?"উত্তর এল:-"চার মাস।"এই উত্তরের ভিত্তিতে হযরত উমর (রাঃ) ঘোষণা দিলেন-
কোনো সৈনিককে চার মাসের বেশি জিহাদের অভিযানে রাখতে নিষেধ এবং
চার মাস পরই তাকে স্ত্রীর কাছে ফিরে আসার সুযোগ দিতে হবেএটি সামরিক প্রশাসনে সরকারি নিয়ম হিসেবে চালু করা হয়। এটি করা হয়েছিল
নারীর শারীরিক–মানসিক অধিকার রক্ষার জন্যে,
দাম্পত্য জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য,
দীর্ঘদিন দূরে থাকার ফলে নফসিক দুর্বলতা, পাপ, অবহেলা, মানসিক কষ্ট—এসব থেকে সুরক্ষার জন্যে আর পুরুষরা নিজ দায়িত্বে যেনে অসাবধান না হয়।
-ইমাম কাসীর (তাফসীর ইবন কাসীর, সূরা বাকারা ২২৬–২৭ ব্যাখ্যা)

# পিতামাতা ও সন্তানদের মধ্যে সম্পর্ক

**সন্তানের বংশধারা অস্বীকার করা পিতার জন্য হারাম ।**নিছক সন্দেহ, কুধারণা এবং গুজবের কারণে নিজ সন্তানকে অস্বীকার করা কখনই ইসলাম সমর্থন করে না। যদি প্রমাণ ও লক্ষণাদির ভিত্তিতে স্বামী নিশ্চিত হয় যে, স্ত্রী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তবে ইসলামী শরীয়ত সেই সন্তানের লালন-পালন তার কাঁধে চাপিয়ে দিবে এটাও ইসলাম সমর্থন করে না। এক্ষেত্রে ইসলাম একটি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে, যা শরীয়াতে লিয়ান হিসেবে পরিচিত। যখন কোনো ব্যক্তি নিশ্চিত হয়, তার স্ত্রী বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, অন্যের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ না থাকে, তবে তার কর্তব্য হলো, বিচারকের নিকট উপস্থাপন করা। বিচারক তাদের মাঝে লিয়ান এর ফয়সালা করবেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আছে, "আর যারা তাদের স্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, অথচ

তাদের পক্ষে কোনো সাক্ষী নেই নিজেরা ছাড়া" যদি স্বামীর কাছে চারজন সাক্ষী না থাকে, তবুও তার অভিযোগ নষ্ট হবে না বরং একটি বিশেষ শপথ প্রক্রিয়া শুরু হবে।সে (স্বামী) চারবার আল্লাহর নামে শপথ করবে যে সে সত্যবাদী। আর পঞ্চমবার বলবে: যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে আল্লাহর লানত তার ওপর।আর স্ত্রী তার ওপর শাস্তি দূর করতে চারবার আল্লাহর নামে শপথ করবে যে স্বামী মিথ্যাবাদী; আর পঞ্চমবার বলবে যে যদি স্বামী সত্যবাদী হয়, তবে আল্লাহর গজব তার ওপর।"
-(সূরা নূর, আয়াত:৬-৯)। অত:পর তাদের দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেয়া হবে। আর সন্তানটিকে মায়ের সাথে জুড়ে দেয়া হবে।

**অন্যের পুত্রকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করা হারাম** আল্লাহ তাআলা বলেন, " আর যাদেরকে তোমরা দত্তক নিয়েছ, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র; আল্লাহ সত্য কথা বলেন এবং তিনিই সঠিক পথ দেখান।তোমরা তাদেরকে তাদের প্রকৃত পিতার নামে ডাকো। এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত। আর যদি তোমরা তাদের পিতা না জানো, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই এবং মাওলা। তোমরা অজান্তে ভুল করলে তাতে তোমাদের জন্য পাপ নেই; কিন্তু যা তোমাদের হৃদয় ইচ্ছাকৃতভাবে করে — তাতে (পাপ আছে)। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"
(সূরা আহযাব, আয়াত:৪-৫)

**পালিত পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা বৈধ।**কেননা, বাস্তবতা হল, সে নারী একজন অনাত্মীয়ের স্ত্রী । সুতরাং পালকপুত্র যখন তাকে তালাক দিবে বা সে মারা যাবে তখন তার স্ত্রীকে বিয়ে করা হালাল। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কার্যকর করার লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা স্বয়ং রাসূল(সা:) কে নির্বাচন করেছেন। যাতে সকল সংশয়-সন্দেহ দূরীভুত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর (স্মরণ কর) যখন তুমি সেই ব্যক্তিকে বলেছিলে, যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমি-ও অনুগ্রহ করেছ—'তোমার স্ত্রীকে (তোমার কাছেই) রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।' আর তুমি তোমার অন্তরে এমন বিষয় লুকিয়ে রাখছিলে, যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন; তুমি মানুষকে ভয় করছিলে, অথচ আল্লাহই অধিক হকদার যে তুমি তাঁরকেই ভয় করবে। অতঃপর যখন যায়েদ তার প্রয়োজন পূরণ করে তাকে (তালাক দিয়ে) পৃথক করল, তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মুমিনদের ওপর তাদের দত্তকপুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে কোনো সংকট না থাকে, যখন তারা তাদের প্রয়োজন পূরণ করে (তালাক দেয়)। আর আল্লাহর আদেশ অবশ্যম্ভাবীভাবে কার্যকর হওয়ারই।"-
( সূরা আহযাব, আয়াত :৩৭)

**লালনপালনের জন্য পুত্র পালন বৈধ।**অনেক দম্পতির বাচ্চা হচ্ছে না যেটা আমাদের সমাজে খুবই প্রচলিত, কারো ছেলে বাচ্চা হচ্ছে না, তখন যদি কোনো ব্যক্তি কুড়িয়ে পাওয়া বা কোনে ইয়াতিম শিশুকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে তার লালন পালন করতে চান নিজ পুত্রের মত, তিনি অবশ্যই তা করতে পারেন। ইসলামে এটি হালাল। রাসূল (সা:) বলেন,

“আমি এবং ইয়াতিমের অভিভাবক জান্নাতে এভাবে থাকব। এ কথা বলার সময় তিনি তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং দুটির মাঝে ফাঁক করে দেখালেন।”- (সহীহ বুখারী:৫৩০৪)
কুঁড়িয়ে পাওয়া শিশু ইয়াতিমের অন্তর্ভুক্ত। এক্ষেত্রে পথশিশু শব্দটিও ব্যবহার করা হয়। কোনো ব্যক্তির সন্তানাদি না থাকলে সে ইয়াতিম শিশুকে লালনপালন করেছে, তাকে সে কিছু দিয়ে যেতে চায় সম্পত্তির ভাগ, তবে সে জীবিত অবস্থায় যা কিছু ইচ্ছে তাকে দিয়ে যেতে পারবে। মৃত্যুর পূর্বে তার জন্যে পরিত্যক্ত সম্পদের এক তৃতীয়াংশ অসিয়ত করে যেতে পারবে।

**নিজ পিতা ব্যতীত অন্য কারো সাথে বংশ মেলানো সন্তানের জন্য হারাম।**
নিজেকে নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কারো সন্তান হিসেবে দাবী করাও হারাম। রাসূল (সা:) বলেন,
“যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতা বলে দাবী করে,অথবা যার মালিক সে নয়—অপর কারো গোলাম (দাস) হওয়ার দাবি করে,তার ওপর আল্লাহর লা'নত, ফেরেশতাদের লা'নত এবং সকল সৃষ্টির লা'নত।কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে কোন তাওবা কিংবা পরিবর্ত বিকল্প গ্রহণ করা হবে না।”
(সুনান ইবন মাজাহ: ২৬০৯)

**দানের ক্ষেত্রে সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা :**
কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ বা প্রয়োজন ব্যতীত দানের ক্ষেত্রে এক সন্তানের ওপর আরেক সন্তানকে প্রাধান্য দেয়া হারাম। এতে একে অপরের মাঝে হিংসা বিদ্বেষ তৈরী হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা উচিত। এটাই ইসলামের নির্দেশনা।
রাসূল (সাঃ) বলেন, “তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে পূর্ণ ইনসাফ কর। তোমরা তোমাদের সন্তানদের মাঝে পূর্ণ ইনসাফ কর। সন্তানদের মাঝে পূর্ণ ইনসাফ কর।”

**পিতামাতার অবাধ্যতা কবীরা গুণাহ :-**
সন্তানের উচিত তার পিতামাতাকে সম্মান করা ও আনুগত্য করা। পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমলগুলোর একটি। কুরআন ও হাদীসে বারবার এ বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা এসেছে।আল্লাহ বলেন, “তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক কোরো না, এবং পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো।”
(সূরা নিসা: ৩৬)।তিনি আরও বলেন,
“তুমি তাদের সামনে নম্রতা ও দয়া প্রদর্শন করো এবং বলো‘হে আমার রব, তাদের প্রতি রহম করো, যেভাবে তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।’”
— (সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত:২৩–২৪)
আরও বলেছেন
“তোমার পালনকর্তা নির্দেশ দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত করো এবং পিতামাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদের মধ্যে একজন বা উভয়ই তোমার কাছে বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছায়, তবে তাদের প্রতি ‘উফ’ বলিও না এবং তাদের কাছে রাগ প্রকাশ করিও না; বরং

তাদের প্রতি সদয়ভাবে কথা বলো। নম্র ও কৃপাশীলভাবে তাদের সঙ্গে আচরণ করো, এবং বলো: ‘হে আমার পালনকর্তা! আমাকে তাদের প্রতি দয়া করার ক্ষমতা দাও, যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।’-
(সূরা ইসরা,আয়াত:২৩-২৪)

<u>এমনকি পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদে যাওয়া ও নিষিদ্ধ।</u> যদিও জিহাদের সওয়াব অনেক বেশি, সারারাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া, সারাদিন রোজা রাখার চেয়েও বেশি। এক ব্যক্তি রাসূল (সা:) এর কাছে এসে বলল:“আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই।”নবী (সাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন:
“তোমার কি মা-বাবা জীবিত আছেন?”
সে বলল: “হ্যাঁ।”
নবী (সাঃ) বললেন:
“তবে তাদের সেবা করাই তোমার জন্য জিহাদ।”
(সহীহ বুখারী: ৩০০৪)

**মুশরিক পিতামাতার সাথে আচরণ :-**
পিতামাতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, “যদি তারা তোমার প্রতি চাপ সৃষ্টি করে, অথবা তোমাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত রাখে, তখন তাদের প্রতি অন্যায় বা কষ্ট করা নয়। কিন্তু তুমি তাদের সঙ্গে সদয়ভাবে কথা বলো।”
(সূরা লোকমান, আয়াত:১৪-১৫)
রাসূল (সা:) বলেন, “যদি পিতামাতা তোমাকে কুফর বা শিরক করার জন্য চাপ দেয়, তাদের কথা মানিও না, কিন্তু শালীন ও সদয় আচরণ করো।”-
(সহীহ মুসলিম)
কেউ নবী (সা:)-কে জিজ্ঞেস করেছিল: “যদি আমার পিতামাতা কুফরী হয়, আমি কি তাদের সম্মান করব?”তিনি বললেন: “হ্যাঁ, তবে তারা যদি তোমাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত না করে। যতক্ষণ তারা তোমাকে বাধা দেয় না, সদ্ব্যবহার করো।”-
(সহীহ বুখারী)

# মীরাস বন্টনে আল্লাহর বিধান

কারও মৃত্যু হলে, তার রেখে যাওয়া বৈধ সম্পদ (টাকা, জমি, সোনা, ব্যবসা ইত্যাদি) নির্দিষ্ট নিয়মে তার আত্মীয়দের মাঝে বণ্টন করাকে মীরাস বণ্টন বলে।কোনো সন্তানকে মীরাস থেকে বন্ঞ্চিত করা পিতার জন্য বৈধ নয়। সে ছেলে হোক বা মেয়ে সন্তান। এমনকি কৌশল করে কোনো আত্মীয়কে তার প্রাপ্য উত্তরাধিকার থেকে বন্ঞ্চিত করা ও সম্পূর্ণ হারাম। কেননা, মীরাস হল আল্লাহ তাআলার নির্ধারণ করা নিয়ম। তিনি তার বিধান ও শরীয়তের ওপর মানুষকে অবিচল থাকতে বলেছেন। যে ব্যক্তি তাঁর নির্ধারিত সীমা এবং বন্টন রীতির বিরুদ্ধাচরণ করবে সে তার প্রতিপালককে দোষারোপ করছে।
মীরাস বন্টন হতে হবে কুরআন–হাদীসের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ী।ইসলামে উত্তরাধিকার বণ্টনের বড় কয়েকটি মূলনীতি আছে:
প্রথমে তিনটি কাজ শেষ করতে হবে
মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে আগে বের হবে:
(১)কাফন–দাফন খরচ (অতিরিক্ত অপচয় ছাড়া)
(২)মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া ঋণ পরিশোধ করা।
(৩)বৈধ উইল (ওসিয়ত) সর্বোচ্চ সম্পদের ১/৩, এবং কোনো ওয়ারিশের নামে উইল নয় "ওয়ারিশের জন্যে ওসিয়ত নেই" ( আবু দাউদ, তিরমিযি) এর পর যা বাকি থাকবে, সেটাই মীরাস হিসেবে ভাগ হবে।

## এখানে ওয়ারিশ হয়:-

(১) আসহাবুল ফুরূয (যাদের নির্দিষ্ট অংশ কুরআনে বলা আছে), যেমন:বাবা, মা,দাদা (কখনও),স্ত্রী/স্বামী
মেয়ে, নাতনি,মা–দিকের ভাই–বোন ইত্যাদি।
(২) আসাবা – যারা নির্দিষ্ট ভগ্নাংশ নয়, বাকি অংশ নেয়।যেমন:ছেলে,সহোদর ভাই, পিতার দিকের ভাই ইত্যাদি।
(৩)যুলো আরহাম – দূর আত্মীয়, যারা সাধারণত তখন পায়, যখন উপরোক্ত কেউ থাকে না।
এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হল **একজন পুরুষের অংশ দুই নারীর সমান।** সবক্ষেত্রে নয়, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, যেমন:"আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দেন: একজন পুত্রের অংশ দুই কন্যার সমান।" (সূরা আন-নিসা,আয়াত:১১)
এর পেছনে কারণ:

- ইসলামে ভরণ–পোষণ, মহর, বাসস্থান, নান্দনিক খরচের দায়িত্ব পুরুষের ওপর।
- নারী তার সম্পদের কোনো খরচের জন্য শরয়ীভাবে বাধ্য নয়, চাইলে সবই নিজের জন্য রাখবে

তাই অনেক ক্ষেত্রে পুরুষ বেশি পেলেও, খরচের দায় তার গায়ে, নারীর নয়। এখানে কিছু উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা খুব ভালো করে বুঝতে পারি।আল্লাহ তাআলা বলেন, "তোমাদের স্ত্রীলোকরা যা রেখে যায়—যদি তাদের সন্তান না থাকে—তোমাদের জন্য তার অর্ধেক। আর যদি তাদের সন্তান থাকে, তবে তোমাদের জন্য এক-চতুর্থাংশ, তারা যে ওসিয়ত করবে বা

ঋণ রেখে যাবে তা আদায়ের পর।আর তোমরা যা রেখে যাবে—যদি তোমাদের সন্তান না থাকে—তাহলে তোমাদের স্ত্রীদের জন্য তার এক-চতুর্থাংশ। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তাহলে তাদের জন্য এক-অষ্টমাংশ, ওসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর।আর যেসব ব্যক্তি 'কালালা' (অর্থাৎ পিতা-মাতা ও সন্তানবিহীন) অবস্থায় মারা যায় এবং তার এক ভাই বা এক বোন থাকে—তবে প্রত্যেকে পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। আর যদি একাধিক হয়, তবে তারা সবাই মিলে পাবে এক-তৃতীয়াংশ। ওসিয়ত পরিপালন ও ঋণ পরিশোধের পর—যতক্ষণ না কারও ক্ষতি করা হয়।এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ; আর আল্লাহ সবকিছু জানেন, সহনশীল।"-
(সূরা নিসা,আয়াত:১২)

**উদাহরণ–১: শুধু ছেলে ও মেয়ে আছে**
একজন মারা গেলেন, রেখে গেলেন:
১ জন ছেলে,১ জন মেয়ে,স্ত্রী/বাবা–মা নেই
এখানে ছেলে ও মেয়ে আসাবা হবে। তারপর:
মোট অংশ = ৩ (ছেলের জন্য ২, মেয়ের জন্য ১)
ধরা যাক সম্পদ = ৩ লাখ টাকা
ছেলে পাবে = ২ লাখ
মেয়ে পাবে = ১ লাখ
(অর্থাৎ ছেলে:মেয়ে = ২:১)

**উদাহরণ–২: স্ত্রী ও ২ মেয়ে আছে, ছেলে নেই**
মারা গেলেন, রেখে গেলেন:স্ত্রী,২ মেয়ে
বাবা–মা নেই, ছেলে নেই।
কুরআনের বিধান অনুযায়ী:
স্ত্রীর অংশ = সম্পদের ১/৮ (যদি মৃতের সন্তান থাকে –(সূরা নিসা, আয়াত: ১২)
২ মেয়ে = একত্রে সম্পদের ২/৩ (নিসা ৪:১১)
যদি মোট সম্পদ ২৪০,০০০ হয়:
স্ত্রী পাবে ১/৮ = ৩০,০০০
২ মেয়ে পাবে ২/৩ = ১৬০,০০০ (প্রতি মেয়ে ৮০,০০০ করে)
কিছু ক্ষেত্রে হিসাব সামঞ্জস্য করে ভাগকে পূর্ণসংখ্যায় নিই, আলেমরা পেশাদার হিসাব করেন।

**উদাহরণ–৩: বাবা, মা, স্ত্রী, ১ ছেলে, ১ মেয়ে**
মারা গেলেন, রেখে গেলেন:
বাবা,মা,স্ত্রী,১ ছেলে,১ মেয়ে
এক্ষেত্রে:
স্ত্রী – ১/৮ (কারণ সন্তান আছে)

মা – ১/৬ (সন্তান আছে –( সূরা নিসা, আয়াত:১১)
বাবা – কমপক্ষে ১/৬, বাকি অংশেরও আসাবা হিসেবে পেতে পারেন
ছেলে–মেয়ে – বাকি অংশে ছেলে:মেয়ে = ২:১ অনুপাতে
এখানে হিসাব একটু টেকনিক্যাল
সাধারণত আলেম/ মুফতির মতে হিসাব করা উত্তম।

**মীরাস না দেওয়া বড় গুনাহ**
অনেক সমাজে মেয়েদের বা দুর্বল আত্মীয়দের মীরাস থেকে বঞ্চিত করা হয়, যেমন:
"মেয়ে তো বাপের বাড়ি থেকে কিছু পাবে না" – এগুলো স্পষ্ট জুলুম ও হারাম। কুরআন আল্লাহ তাআলা বলেন,
"আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করে যে ব্যক্তি আল্লাহ তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার নিচ দিয়ে নদী প্রবাহিত সেখানে সে চিরকাল থাকবে। আর এটাই বড় সফলতা।আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের অবাধ্যতা করবে এবং তাঁর সীমা লঙঘন করবে—আল্লাহ তাকে আগুনে নিক্ষেপ করবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে, এবং তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।"
-(সূরা আন-নিসা, আয়াত:১৪-১৫)

# বিশ্বাস ও অনুসরণ

**কুসংস্কার ও ভ্রান্তধারণা** :- ইসলামে যে কোনো কুসংস্কার, অশুভ লক্ষণ, রাশিফল, তাবিজ–গিঁট, অযৌক্তিক ভ্রান্ত ধারণা—সব নিষিদ্ধ। কুসংস্কার তাওহীদের বিপরীত।যে কোনো কুসংস্কার মানুষকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করতে শেখায়। শুধু আল্লাহর উপর ভরসা করা এবং সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করাই একজন মুসলিমের পথ।
(১)**গণককে বিশ্বাস করা কুফরী**:-
ইসলাম শুধু গণক ও প্রতারকদের বিরোধিতা তে থেমে থাকেনি বরং যারা ভ্রান্ত ধারণা ও পথভ্রষ্টতার দরুন এসব লোকের কাছে যায়, এদেরকে বিশ্বাস করে, ইসলামে তাদেরকেও এদের পর্যায়ে গণ্য করে।হাতের রেখা, রাশিফল, তারার অবস্থান দেখে ভবিষ্যৎ বলা সবই হারাম।
রাসূল (সাঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি গণকের কাছে যাবে এবং তার কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তার চল্লিশ দিনের নামাজ কবুল হবে না।"
-(সহীহ মুসলিম: ২২৩০,মুসনাদে আহমদ:৯১৭১)
(২)**তীর দ্বারা ভাগ্য জানতে চাওয়া** :-
জাহেলিয়াতের যুগে মানুষজন বিভিন্ন কাজের আগেই সেই কাজে তার কল্যাণ আছে কিনা তা জানার জন্য মূর্তির ঘরে এসে তীর দ্বারা ভাগ্য জানতে চাইত। এটা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে হারাম। এটা এখন খুব বেশি প্রচলিত না হলেও আধুনিক সমাজে, কিছু কাজ যেমন: কড়ি, বই খুলে ফাল লওয়া, পেয়ালা পড়া, চাল পড়া ইত্যাদি জাহেলী যুগের তীর দ্বারা ভাগ্য

পরীক্ষার মতই অনেকটা। এরকম সাদৃশ্যপূর্ণ যত কাজ আছে ইসলামে তার সবটাই হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, "এছাড়াও ভাগ্য নির্ধারণকারী শর দ্বারা ফয়সালা করা—এ সবই পাপ।"

-(সূরা মায়িদা,আয়াত:৩)

**(৩)শুভ–অশুভ নির্ধারণ:-**

বিশেষ সময়ে কাজ করলে ক্ষতি হবে এমন ধারণা,

নির্দিষ্ট পশু/পাখির ডাককে অশুভ মনে করা, জোড়া শালিক না দেখা, চোখ নড়া, বাম হাত চুলকালে টাকা খরচ হবে, কোনো পাখির আওয়াজ শোনা,মঙ্গলবারে কাজ শুরু করা অশুভ ইত্যাদি

বিষয়কে শুভ অশুভ মনে করা ইসলামে হারাম করা হয়েছে।রাসূল (সাঃ) বলেছেন:

"তৈরাহ (অশুভ লক্ষণ বিশ্বাস) হলো শিরক।"

(সহীহ বুখারী:৭৫০৫, সহীহ মুসলিম:২২২৪)

মূলত এটি মানুষের মধ্যকার দূর্বলতা যা কোনো বস্তু বিশেষ জিনিসকে অশুভ মনে করে প্ররোচিত করে। তাই, মানুষের উচিত এ ধরণের দূর্বলতায় আত্মসমর্পণ না করা এবং তাতে নিমগ্ন না থাকা। বিশেষ করে যখন তা আমলের পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন তা থেকে বেঁচে থাকা।

**(৪)যাদু:-**

রাসূল (সা:) যাদু করাকে ধ্বংসাত্মক কবীরা গুণাহ বলেছেন।যা ব্যক্তির আগেই তার জাতিকে ধ্বংস করে দেয়। ইসলাম যাদু ও যাদুকরদের বিরোধিতা করেছে। তদুপরি যাদুকরদের নিকট যাওয়া এবং তাদের অদৃশ্য ও গোপন বিষয়াদি জিজ্ঞেস করাকে ইসলাম হারাম করেছে। কোনো রোগের চিকিৎসার জন্য অথবা কোনে সমস্যা সমাধানের জন্য তাদের শরণাপন্ন হওয়াকেও হারাম করা হয়েছে ইসলামে। রাসূল (সা:) বলেন, "যে যাদু করে বা করায় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"— (বায়হাকী)

তিনি আরও বলেন,

"ঝাড়ফুঁক (যা শরীয়ত-বহির্ভূত), তাবিজ, ও তিলা (মায়া-বন্ধন তৈরি করার যাদু) সবই শিরক।"

(সুনানে আবু দাউদ ৩৮৮৩,,ইবনে মাজাহ:৩৫৩০)

**(৫)তাবিজ, গিঁট, সুতা ইত্যাদি দিয়ে অশুভ দূর** হবে এ ধারণা একদমই হারাম চিন্তাভাবনা। রোগ বালাই থেকে সুস্থতা লাভ বা রক্ষা পেতে তাবীজের ব্যবহার, যাদুমন্ত্র পাঠ করা সুস্পষ্ট গোমরাহী এবং তাওহীদের পরিপন্থী।তাবিজে শিরকি কিছু থাকলে তা স্পষ্ট হারাম। রাসূল (সাঃ) বলেন,

"যে তাবিজ ঝুলায়, সে শিরক করল।"

(মুসনাদ আহমদ : ১৭৪৪০)

একদা এক ব্যক্তির হাতে তামিমা (তাবিজ) দেখে রাসূল (সা:) বললেন,"এটা খুলে ফেলো! এটি তোমার কোনো উপকার করবে না। বরং তোমাকে দুর্বলই করবে।"-(মুসনাদ আহমদ :১৬৯৫১)

ইসলাম কেবল কুরআন–সুন্নাহর রুকইয়া গ্রহণ করেছে।মুসলিমের জন্য নিরাপদ পথ হলো রুকইয়া (কুরআনের আয়াত),ফালাক–নাস, আয়াতুল কুরসি, সকাল-সন্ধ্যার দোয়া।

**কুসংস্কার দূর করতে ইসলামের নির্দেশনা:-**

(১)আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসা (তাওয়াক্কুল) করা:-

এটা বিশ্বাস করা যা ক্ষতি–উপকার করে, সবই আল্লাহর ইচ্ছায়।রাসূল (সা:) বলেছেন,
"যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে—তাকে আল্লাহ সেই জিনিসের ওপরই ছেড়ে দেন।"( তিরমিযী ২০৭২)

(২) দোয়া ও রুকইয়া করা:-

আয়াতুল কুরসি, সূরা ফালাক, সূরা নাস, দোয়া: "বিসমিল্লাহিল্লাযী লা ইয়াদুররু মা'আসমিহি..."

(৩) হেফাজতের আমল করা:-

প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় ২বার এ আমল করা।

(৩)জ্ঞান অর্জন করা:-

কুরআন–সুন্নাহ জানা থাকলে কুসংস্কার জায়গা পায় না।

(৪)ভিত্তিহীন গল্প, লেকচার এড়ানো:-

ইসলামে প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করা বৈধ নয়।

# ইসলামে স্বজনপ্রীতির ধারণা

ইসলামে স্বজনপ্রীতি (Nepotism)অর্থাৎ নিজের আত্মীয়-স্বজনকে অন্যায়ভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ এটি সমাজে ন্যায়বিচার, আস্থা, আমানতদারিতা এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাকে নষ্ট করে। কুরআনের নির্দেশ বলা হয়েছে, "আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন।তোমরা আমানত তার যোগ্য ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেবে।"(সূরা নিসা, আয়াত:৫৮)
অর্থাৎ দায়িত্ব, পদ, কাজ, সুযোগ -যে যোগ্য, তাকেই দিতে হবে; শুধু আত্মীয় বলে অগ্রাধিকার দেওয়া হারাম।তিনি আরও বলেন, "ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করো, যদিও তা তোমাদের নিজের বিরুদ্ধে, পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।"
(সূরা নিসা,আয়াত:১৩৫)
মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে, শুধু রক্তের সম্পর্কের কারণে সত্য মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় সর্বক্ষেত্রে নিজ সম্প্রদায়কে সহায়তা করা।কেননা,রাসূল (সা:)বলেন:"যদি ফাতিমা (রাযি.) চুরি করত, আমি তাঁর হাতও কেটে দিতাম।"(
সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
নবী(সা:) তাঁর প্রিয় কন্যার ক্ষেত্রেও পক্ষপাত করতেন না। ন্যায়বিচারে আত্মীয়ের জন্য বিশেষ ছাড়—এটাই স্বজনপ্রীতি, যা ইসলামে হারাম। মুসলমানের মাঝে কোনো অঞ্চলের পক্ষপাতিত্ব, জাতীয়তার পক্ষপাতিত্ব নেই। বরং যে এটা সমর্থন করবে তার ব্যাপারে রাসূল (সা:) ঘোষণা করলেন,"যে ব্যক্তি দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ দিল এমন কারো ওপর, যে তার চেয়ে কম দক্ষ—সে আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে খিয়ানত করল।"এ সম্পর্কে হযরত উমার এর একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে। তা সংক্ষেপে অনেকটা এরকম,
মদিনার এক সাধারণ দিনে খলিফা হযরত উমর (রাঃ) রাজধানীর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। ঠিক তখনই এক সংবাদবাহক ছুটে এলেন। মুখে উদ্বেগ, হাতে একটি পত্র। উমর (রাঃ) পত্রটি খুললেন। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে থাকলেন। চিঠিটিতে লেখা -
"আপনার ছেলে আবদুর রহমান মদ পান করেছেন।"
উমর (রাঃ) শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন,"সে কি শাস্তি পেয়েছে?"উত্তরে বলা হলো, "হ্যাঁ আমিরুল মুমিনীন, স্থানীয় গভর্নর তাকে ৮০ বার দোররা মেরেছেন।" পরে তিনি খবর নিয়ে জানতে পারলেন, স্থানীয় গভর্নর খলিফার পুত্র হওয়ার কারণে তাকে জনসমক্ষে দোররা মারেননি, তখন তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,"তোমরা শাস্তি হালকা করে ফেলেছ! আমার ছেলে হলে কী হয়েছে?আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনো ছাড় নেই।"দূত পাঠিয়ে তিনি ছেলেকে মদিনায় আনার নির্দেশ দিলেন।কিছুদিন পর আবদুর রহমান মদিনায় পৌঁছালেন।তিনি জানতেন তার বাবা কোনো পক্ষপাতিত্ব করবেন না। মসজিদে নববী ঘিরে মানুষজন জড়ো হলো। উমর (রাঃ) ছেলের দিকে তাকালেন, ন্যায়বিচারের অটল দৃষ্টিতে, তিনি বললেন—"আবদুর রহমান! তুমি উমরের ছেলে নও। তুমি একজন সাধারণ মুসলিম। তুমি অন্য কারো পুত্র হলে যেমন শাস্তি পেতে, তেমনই শাস্তি পাবে। যদি নিজের পরিবারের বিষয়ে আমি ছাড় দিই, তাহলে আমি নেতৃত্বের যোগ্য নই।" এ কথা বলে তিনি তার ওপর আবার দোররা প্রয়োগ করতে বলেন।দোররার শব্দ চারদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।মানুষ নিস্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল। এক খলিফা নিজের সন্তানের বিরুদ্ধে আইনের সঠিক প্রয়োগ

করছেন।দোররা খাওয়ার পর আবদুর রহমান দুর্বল হয়ে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়ে মারা যান। এই সংবাদ শুনে উমর (রাঃ) ছেলের নামে কান্না করলেন না, বরং বললেন,"হে আল্লাহ! আমি চেষ্টা করেছি তোমার আইন রক্ষা করতে।পরিবারের প্রতি ভালোবাসা আমাকে ন্যায়ের পথ থেকে সরাতে পারিনি। এটাই যেন আমার সামনে তোমার রহমতের প্রমাণ হয়।"

**বংশ ও বর্ণে গৌরব নেই :-**

জাহেলিয়াত যুগের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে বংশনামা, পিতৃপুরুষদের সম্মান ও মর্যাদা নিয়ে গৌরব করাকে ইসলাম সম্পূর্ণ হারাম করে দিয়েছে। একে অপরকে বলা আমি অমুকের ছেলে, আমি কার বংশধর জানো? আমি শ্বেতাঙ্গ, এ সবগুলোই ইসলাম হারাম করেছে। যেহেতু সকল মানুষের আদি পিতা আদম (আ), যদি বংশধারার গুরুত্বই থাকে তাহলে সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর কোনো বংশে জন্মগ্রহণ কি তার নিজের হাতে? সকল মানুষই আদম (আ) ও হাওয়া (আ) এর সন্তান। কিয়ামতের দিন সকলে বংশনামা বা আভিজাত্য নিয়ে জিজ্ঞাসিত হবে না, বরং জিজ্ঞাসিত হবে কে সবচেয়ে বেশি তাকওয়াবান? রাসূল(সা:) বলেন, "আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহিলিয়াতের গর্ব ও বংশ-পরিচয়ে অহংকার দূর করে দিয়েছেন। মানুষ দুই শ্রেণির—একজন হলো পরহেজগার মু'মিন,অন্যজন হলো পাপী দুনিয়াবি মানুষ।"(সহীহ মুসলিম : ৬৭২৮)

**মৃতব্যক্তির জন্য আর্তনাদ করা :-**

ইসলামে মৃত ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে চিৎকার, বিলাপ, মুখ আঁচড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, বুক চাপড়ানো, অতি শোকপ্রকাশ। এগুলো জাহিলিয়াতের কাজ এবং নিষিদ্ধ। জাহিলী যুগের যে সব আচার ব্যবহার অনুসরণের বিরোধিতা ইসলাম করেছে তার মধ্যে একটি হল মৃতব্যক্তির জন্য আর্তনাদ করা, কান্নাকাটি করা। মৃত্যু হল এক জগত থেকে অন্য জগতে স্থানান্তর কেবল। কেবল স্থানান্তর। আর্তনাদের দ্বারা মৃতকে জীবিত করা যাবে না। তাই সকল মুমিনের উচিত অন্যান্য বিপদের মোকাবিলা সে যেভাবে ধৈর্যের সাথে করে থাকে একইভাবে মৃত্যুর ক্ষেত্রেও ধৈর্য্য অবলম্বন করবে। আর বারবার এ বাণী পাঠ করবে, "নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ তাআলার জন্যে এবং তারই নিকট ফিরে যাব।"

রাসূল (সা:) বলেন, "আমার উম্মতের নারী যারা বিলাপ করে তারা আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।"রাসূল (সা:) আরও বলেছেন:"যে নারী বিলাপ করে (আর্তনাদ করে),জোরে জোরে কান্নাকাটি করে,সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"

(সহীহ বুখারী : ১২৯৪, সহীহ মুসলিম: ৯৩৪)

তাছাড়া "মৃত ব্যক্তি তার পরিবারের বিলাপের কারণে কষ্ট পায়।"রাসূল (সাঃ) বলেন:

"মৃত ব্যক্তি তার উপর পরিবারের বিলাপের কারণে আজাব/কষ্ট পায়।

"(সহীহ বুখারী:১২৮৮–১২৯২)

কারো মৃত্যুতে শোকবস্ত্র পরিধান করা, সাজসজ্জা ত্যাগ করা, বেশ-ভূষা ত্যাগ করা, আকার আকৃতিতে পরিবর্তন করার দ্বারা শোক দুঃখ প্রকাশ করা ইসলামে জায়েয নেই। তবে স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রীর কর্তব্য হল চারমাস ১০ দিন ইদ্দত পালন করা। স্বামীর অধিকার পূরণ, উভয়ের

মধ্যকার পবিত্র সম্পর্ক বিচ্ছেদে এমনটা করাও তার কর্তব্য। এ সময়ে অলংকার ব্যবহার করা উচিত নয় যেন বিবাহে আগ্রহী লোকদের চোখে আকর্ষণীয় হয়ে না উঠে। তবে অস্থির না হয়ে দুঃখ প্রকাশ করা, বিলাপ না করে কান্না করা এগুলো মানুষের স্বভাবগত ধর্ম, কোনো পাপ নেই এতে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি যখন স্বামী না হয়ে বাবা, ভাই, ছেলে, মা ইত্যাদি হবে, তখন মহিলার জন্যে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা না জায়েয।রাসূল (সা:) বলেন, "যে নারী আল্লাহ ও পরকাল দিবসে ঈমান রাখে, তার জন্য কোনো মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে তিন দিনের বেশি শোক পালন করা বৈধ নয়— তবে স্বামীর মৃত্যুর জন্য (ইদ্দতের কারণে) চার মাস দশ দিন শোক পালন করবে।"
(সহীহ বুখারী:১২৮২,সহীহ মুসলিম: ১৪৮৬)

# বীমা কোম্পানী

ইসলামী শরিয়তের দৃষ্টিতে বর্তমান প্রচলিত বীমা সাধারণভাবে হারাম গণ্য হয়। যেমন: জীবন বীমা, দূর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি।

## বীমা হারাম হওয়ার কারণ:-

**১)অতিরিক্ত অনিশ্চয়তা:-**

বীমার ক্ষেত্রে বীমাকারী বার্ষিক একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কোম্পানিকে দিয়ে থাকে। যে ব্যবসা, শিল্প, নৌকা ইত্যাদির বীমা করা হয়েছে তা যদি নিরাপদে থাকে তাহলে কোম্পানি সব টাকাই নিয়ে নেয়। কিন্তু যখন দুর্ঘটনা ঘটে তখন নির্ধারিত টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ দেয়া হয়। এ ধরণের ব্যবস্থা যৌথ অংশীদারিত্ব এবং ব্যবসায়ের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। ইসলামের মতে, বীমার ক্ষেত্রেও লাভ- লোকসান দুই জনের মধ্যে সমানভাবে বহন করতে হবে।
এমনকি বীমাকারী এবং বীমা কোম্পানি উভয়েই যদি পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এসব মেনে নিয়ে নিজ কল্যাণে ভালোভাবে জেনে শুনেও বীমা করলে তা বৈধ হবে না। কারণ সুদখোর, সুদদাতা এবং জুয়া খেলোয়াড়েরা ও নিজেদের সম্মতিক্রমেই তাতে চুক্তিবদ্ধ হয়। কিন্তু পারস্পরিক সম্পর্ক থাকলেই তা বৈধ হতে পারে না। যে কোনো প্রকার লেনদেন সুস্পষ্ট ন্যায়পরায়ণতার সাথে হতে হবে। তাতে সামান্যতম জুলুম ও প্রতারণা থাকতে পারবে না, সকলের সমান লাভ লোকসান নিশ্চিত করতে হবে।

**(২)সুদ :-**

লাইফ ইনস্যুরেন্স বা ডিপোজিট-বেইসড পলিসিতে
বেশি টাকা ফেরত দেওয়া,নির্দিষ্ট লাভ দেওয়া
এসবের মধ্যে সুদের চুক্তি থাকে। সুদ ইসলামে স্পষ্টভাবে হারাম।

**(৩) জুয়ার উপাদান:-**

বীমা চুক্তিতে দু'পক্ষের লাভ-ক্ষতি ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে। কোম্পানি লাভ করে বা গ্রাহক লাভ করে—এটা ভাগ্যনির্ভর। এটা জুয়ার মতো হয়ে যায়, তাই হারাম।

## যে ধরনের বীমা হারাম:-

(১)লাইফ ইনস্যুরেন্স

(২)হেলথ ইনস্যুরেন্স (Commercial form)

(৩)নন-লাইফ ইনস্যুরেন্স (ফায়ার, কার ইনস্যুরেন্স, বিজনেস ইনস্যুরেন্স)

যেগুলো সাধারণ বীমা কোম্পানির মাধ্যমে প্রচলিতভাবে চলে এসবের চুক্তি শরিয়তসম্মত নয় বলে হারাম। ইসলামে বিকল্প (হালাল উপায়)ও বলে দেয়া হয়েছে,যেনো মুসলমানদের জন্য হালাল পথ বেছে নেয়া সহজ হয়। যেমন:-

**তাকাফুল / হালাল বীমা ব্যবস্থা:-**

এটি পারস্পরিক সহযোগিতা (Mutual Assistance) ভিত্তিক।এখানে সুদ নেই,গারার নেই,জুয়ার উপাদান নেই,সদস্যরা সম্মিলিতভাবে ঝুঁকি ভাগাভাগি করেন

কোম্পানি শুধু ব্যবস্থাপনা ফি নেয়।

বাংলাদেশেও কিছু তাকাফুল / ইসলামিক ইনস্যুরেন্স প্রতিষ্ঠান আছে।

**জরুরি প্রয়োজনে বীমা করা লাগলে:-**

কিছু আলেম শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন যখন আইন বা পরিস্থিতি আপনাকে বাধ্য করে, যেমন—

গাড়ির কম্পালসারি থার্ড পার্টি ইনস্যুরেন্স,বিদেশ ভ্রমণে বাধ্যতামূলক ইনস্যুরেন্স,এগুলোতে নিজের ইচ্ছা নয়, বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে গুনাহ হবে না।

# জমি চাষাবাদে হালাল-হারাম

ইসলামে জমি চাষাবাদ, বর্গা/অংশীদারি ভিত্তিতে জমি দেওয়া–নেওয়া এবং তার আয়ের হালাল–হারাম সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশনা আছে। ইসলাম মূলত ন্যায়বিচার ও শোষণমুক্ত লেনদেন নিশ্চিত করতে চায়। চাষাবাদে জমি দেওয়া–নেওয়া কয়েক ভাবে হতে পারে। যেমন:

(১)**জমির মালিক নিজেই জমি চাষ করবে।** এটি একটি প্রশংসনীয় কাজ।রাসূল (সাঃ) এর প্রসিদ্ধ সাহাবীগণ নিজেই নিজেদের জমি চাষাবাদ করতেন এবং সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

(২)**জমির মালিক এমন একজন কে তার জমি চাষ করতে দিবে, যে নিজ যন্ত্রপাতি, শ্রম, বীজ ও পশু কাজে লাগিয়ে তা চাষাবাদ করবে, কিন্তু জমির মালিক তা থেকে উৎপাদিত সম্পদের কোনো কিছুই গ্রহণ করবেননা।** এটিই ইসলামে সবচেয়ে বেশি উত্তম বলে গণ্য করা হয়েছে।

রাসূল (সা:)বলেন, "যে তোমাদের একজন তার ভাইকে জমি দেবে বিনিময় ছাড়া, সেটা তার জন্য বেশি ভাল, সেই তুলনায় নির্দিষ্ট ভাড়া নেওয়ার থেকে।"-(সুনানে ইবনে মাজাহ: ২৪৬২)

তিনি আরও বলেন, “যে কারোর জমি আছে, সে নিজেই তা চাষ করুক, বা তার ভাইকে বিনামূল্যে চাষের জন্য দিক”। -(সহীহ বুখারী: ৫৩৩)

(৩) **বর্গায় জমি চাষ হালাল।** কোনো ব্যক্তি নিজের যন্ত্রপাতি, শ্রম, বীজ ও পশু ব্যবহার করে চাষাবাদ করে, তাহলে জমির মালিক তাকে এ শর্তে জমি দিতে পারে যে জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক, এক-তৃতীয়াংশ, অথবা উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত যেকোনো অংশ, তাকে দিতে হবে। কৃষক ও জমির মালিক নিজেদের মধ্যে আগেই যে অনুপাতে একমত হবে, সেই অনুপাতে ফসল ভাগ করে নেওয়া জায়েয। এটিই ইসলামে মুজারাআ (অংশীদারি ভিত্তিক চাষাবাদ) নামে পরিচিত, এবং এটি বৈধ। রাসূল (সাঃ) খায়বারবাসীকে খায়বারের জমি অর্ধেক ফসলের ভিত্তিতে চাষাবাদ করতে দিয়েছেন। এই পদ্ধতিতে এটা কখনো সহীহ নয় যে, কারো জন্যই একটা নির্ধারিত অংশ থাকবে, এতে দেখা যাবে জমিতে ঐ পরিমাণই ফসল হবে, এর বেশি হবে না, ফলে একজন তা সানন্দে গ্রহণ করবে আর অন্যজন বঞ্চিত হবে। তাই, উভয়কে উৎপাদিত ফসলের একটা অংশ নির্ধারণ করতে হবে যেনো জমিতে বেশি ফসল উৎপাদিত হলে উভয়েই লাভবান হয় আর কম হলে উভয়পক্ষই সমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটিই সেই নীতি যা চাষী ও জমির মালিকের মাঝে ইনসাফের সাথে ফসল ব্‌ন্টন করে থাকে।

(৪) **নগদ টাকায় জমি চাষাবাদ হারাম।** কেননা, “রাসূলুল্লাহ (সা:)জমি ভাড়া (কেরায়া) নেওয়া-দেওয়া থেকে নিষেধ করেছেন।”

-(সহীহ মুসলিম:১৫৪৭)

যেহেতু এতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

# পশুপালনে শরীকানা

আমাদের দেশে বিশেষ করে গ্রামে শরীকের ভিত্তিতে পশুপালনের পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইসলামে পশুপালনে শরীকানা (অংশীদারি/পার্টনারশিপ) পুরোপুরি বৈধ যদি শর্তগুলো পরিষ্কার ও ন্যায়সঙ্গত হয়। কেননা,আল্লাহ বলেন আমি তৃতীয় হয়ে থাকি সেই দুই অংশীদারের মাঝে, যতক্ষণ তারা পরস্পরের সাথে খিয়ানত না করে।” (সুনানে আবু দাউদ:৩৩৮৩)

ইসলামিক ফিকহে পশু-সংক্রান্ত শরীকানা সাধারণত তিনভাবে হয়ে থাকে:

**১) মূলধন শরীকানা:-**

দু’জন বা তার বেশি ব্যক্তি টাকা দিয়ে গরু/ছাগল/হাঁস-মুরগি কিনে ব্যবসা করবে।

<u>শর্ত:</u>

- সবার মূলধনের পরিমাণ জানা থাকতে হবে।
- লাভ ঐ মূলধনের অনুপাতে ভাগ হবে।
- ক্ষতিও মূলধনের অনুপাতে বণ্টিত হবে।

এটি শরীয়তসম্মত মুশারাকা (মালিকানাভিত্তিক শরীকানা)।

২) **শ্রম-ও-যত্ন ভিত্তিক শরীকানা :-**

একজন পশু কিনে দেবে, আরেকজন লালন-পালন ও বাজারে বিক্রি পর্যন্ত দেখাশোনা করবে।তবে দ্বিতীয় লোক পশুর দুধ নিয়ে অথবা চাষাবাদ, পানি সেচন করে এর দ্বারা ফায়দা হাসিল করতে পারবে। আর এটি জায়েয। কেননা, শরীয়াতে এর সাদৃশ্যপূর্ণ হুকুম এসেছে।বন্ধককৃত বস্তু যদি পশু হয়ে থাকে এক্ষেত্রে রাসূল (সা:) বলেন, "বন্ধককৃত পশুর উপর আরোহণ করা যাবে এবং এর দুধ পান করা যাবে। আর যে তা করবে, সেই বন্ধককৃত পশুর খাদ্য পানীয়ের খরচ বহন করবে।"-(সহীহ বুখারী:২৫১২)

অর্থাৎ পশুর খরচ বহনের বিনিময়ে এর উপর আরোহণ ও এর দুধ গ্রহণ বৈধ।

<u>শর্ত:</u>

- পশুর মালিকানা একজনের, আরেকজন শ্রম দেবে
- দু'জনে আগে থেকেই লাভের শতাংশ ঠিক করবে (৩০–৭০ / ৪০–৬০ ইত্যাদি)
- ক্ষতি হলে মালিক মূলধনের ক্ষতি বহন করবে
- পরিচর্যা-কারী প্রচেষ্টা হারাবে কিন্তু ক্ষতির টাকা বহন করবে না (এটাই ফিকহে নিয়ম)

এটিকে মুদারাবাহ সদৃশ শরীকানা বলা হয় এবং এটি হালাল।

৩) **পশু উৎপাদন-ভিত্তিক শরীকানা:**

যেমন, দুধ ভাগাভাগি, বাছুর ভাগাভাগি, ডিম/ছানা ভাগাভাগি।

<u>শর্ত:</u>

- শুরুতেই ফসল/উৎপাদনের অংশ নির্ধারিত থাকতে হবে (যেমন ৫০-৫০ বা ৬০-৪০)
- মালিক ও শ্রমদাতা উভয়ের দায়িত্ব নির্দিষ্ট থাকতে হবে

এটি মুজারা/মুসাকাতের মতো অংশীদারি, ফিকহে বৈধ। তবে, যে বাছুরটি দ্বারা কোনো কাজ করানো যায় না এবং এটি দুধও দেয় না। এ ধরণের বাছুর যদি এ ভিত্তিতে পালন করে একজন মূল্য প্রদান করবে আর দ্বিতীয়জন খাদ্যপানীয়ের পূর্ণ খরচ একাই বহন করবে। তবে ইসলাম কখনও এটি সমর্থন করে না। কেননা, এখানে দ্বিতীয় পক্ষ একাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তার খরচের বিনিময়ে সে কোনো লাভ পাচ্ছে না। অন্যদিকে প্রথম পক্ষ এক চেটিয়া লাভ পাচ্ছে। আর এটি কখন ও সেই ন্যায়নীতির অন্তর্ভুক্ত নয় যা ইসলাম দাবি করে।

## যেসব শরীকানা হারাম:-

**১) অংশ কত পাবে তা অস্পষ্ট হলে:-**

যেমন-"যা বেশি হবে তা আমার","দেখে পরে ভাগ করব" গারার (অনিশ্চয়তা) হওয়ার কারণে হারাম।

**২) এক পক্ষ নিশ্চিত মুনাফা দাবী করলে:-**

যেমন-"প্রতি মাসে আমাকে ১০,০০০ টাকা দেবে, লাভ-ক্ষতি যাই হোক"। এটি সুদ-সদৃশ, শরীয়তে বৈধ নয়।

**৩) ক্ষতি পুরোপুরি শ্রমদাতার ওপর চাপালে:-**

ইসলামের নিয়ম:লাভ ভাগ করা যায়, ক্ষতি মূলধন মালিকের উপর, শ্রমদাতার কেবল শ্রম নষ্ট হবে।

এ নিয়ম ভঙ্গ করলে চুক্তি হারাম।

**৪) প্রতারণা, লুকানো তথ্য, অসুস্থ পশু লুকানো:-**

এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

# অবসর সময়ে খেলাধুলা ও বিনোদন

ইসলামে খেলাধুলা (Sports) সম্পূর্ণ বৈধ— বরং শরীর সুস্থ রাখা, শক্তিশালী থাকা, যুদ্ধকৌশলে পারদর্শী হওয়া এবং মনকে প্রশান্ত রাখার জন্য খেলাধুলা উৎসাহিত করা হয়েছে। নবী করীম (সাঃ) এর সাহাবীগণ ও মাঝে মাঝে রসিকতা করতেন, হাসতেন এবং ইসলামে বৈধকৃত খেলাধুলা করে মনকে প্রফুল্ল রাখতেন। বৈধ খেলাধুলার দ্বারা নিজে ও বন্ধু- বান্ধবদের আত্মাকে প্রশান্তি দেয়ার মাঝে কোনো দোষ নেই। তবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত যেনো এটি অভ্যাসে পরিণত না হয়। কেননা, এতে তার ওপর আবশ্যক করা কাজগুলোতে সে অনীহা প্রকাশ করবে এবং যেখানে দৃঢ়তার সাথে কথা বলা প্রয়োজন সেখানেও হাসি-ঠাট্টা করবে। একজন মুসলমানের জন্য কখনই এটি সমর্থনযোগ্য নয় যে সে লোকদের মান মর্যাদার দিকে খেয়াল না রেখে তাকে নিয়ে অযথা হাসি-ঠাট্টা করবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে ঈমানদারগণ!একদল মানুষ যেন অন্য আরেকদলকে উপহাস না করে,হতে পারে তারা (যাদের উপহাস করা হচ্ছে) তাদের চেয়ে উত্তম...”

-(সূরা হুজুরাত, আয়াত:১১)

তিনি আরও বলেন, “ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য, যে অন্যকে পিছনে বা সামনে বিদ্রূপ করে, দোষ খুঁজে বেড়ায়।”(সূরা হুমাযাহ, আয়াত: ১)

লোকদের হাসানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়াকেও হাদিসে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল (সা:) বলেন: “ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে। ধ্বংস তার জন্য! ধ্বংস তার জন্য!”

(সুনান আবু দাউদ:৪৯৯০)

## দৌড়ানো :-

ইসলামে দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ হালাল, বরং সুন্নাহ থেকে এর জায়েয ও উৎসাহিত হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ আছে।হাদিসে এসেছে, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন:“আমি নবী(সাঃ) এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছি। প্রথমবার আমি জিতেছিলাম, পরে যখন আমার শরীরে ওজন বেড়ে গেল তখন তিনি জিতলেন।”(সুনান আবু দাউদ,২৫৭৮)

এই হাদিস স্পষ্ট প্রমাণ যে দৌড় প্রতিযোগিতা হালাল এবং ইসলাম উৎসাহ দেয়।কারণ এতে শরীর সুস্থ ও শক্তিশালী থাকে। আর শরীর শক্তিশালী রাখা সুন্নাহ।

রাসূল (সা:) বলেন,“শক্তিশালী মুমিন দুর্বল মুমিনের তুলনায় উত্তম।”(সহীহ মুসলিম,২৬৬৪)

দৌড় প্রতিযোগিতা হালাল, তবে কিছু শর্ত রয়েছে:

- নামাজ যেনো নষ্ট না হয়।
- অশ্লীল পোশাক না থাকে।
- পুরুষ–নারীর মিক্সড দৌড় না হয়।
- জুয়া বা বেটিং না থাকে।
- শরীরের ক্ষতি হয় এমন কিছু না থাকে।

এই সব শর্ত মানলে দৌড়ানো = ইবাদতের কারণ, কারণ এটি শরীরকে শক্তিশালী রাখে।

## তীর-ধনুক বা বল্লম চালানো :-

শরীয়তে অনুমোদিত খেলার মধ্যে অন্যতম হল তীর ও বল্লম খেলা। এ তীর নিক্ষেপ শুধু খেলা নয়, বরং তা হচ্ছে শক্তি অর্জনের মাধ্যম। কেননা, আল্লাহ তাআলা কুরআনে আদেশ দিয়েছেন, "তোমরা তাদের (শত্রুদের) বিরুদ্ধে যা কিছু পারো শক্তি প্রস্তুত কর, ঘোড়ার যুদ্ধের সাজসজ্জা ও প্রস্তুতি রেখো, যাতে শত্রু আল্লাহ এবং তোমাদের শত্রুদের ভয় পায়।"-(সূরা আনফাল,আয়াত:৮)

হাদীসে আছে, "তোমরা তীর নিক্ষেপ শিখো, কারণ এটি তোমাদের জন্য উত্তম।"(সহীহ মুসলিম:১৯১৭)

তবে রাসূল (সা:) জন্তুকে তীর নিক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু বানানোর ব্যপারে সতর্ক করেছেন। কোনো জন্তু অযথা অপ্রয়োজনে খেলার ছলে তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজের বিনোদনের জন্য হত্যা করা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। আর এটি শোভনীয় নয় যে, কোনো প্রাণবন্ত জীব মানুষের খেলার বস্তু হয়ে প্রাণ হারাবে। এছাড়া পশুদের উত্তেজিত করে একজনকে আরেকজনের ওপর লেলিয়ে দেয়া এরকম খেলা ইসলামে নিষিদ্ধ। জাহেলী যুগে আরবের মানুষেরা দুটি ছাগল বা দুটি ষাঁড়ের মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিত। এসব পশুপাখি লড়াই করতে করতে মারা যেত আর এসব দেখে তারা মজা পেত, আনন্দ-উল্লাস করত। ইসলাম এই নির্মমতাকে হারাম ঘোষণা করেছে।

## ঘোড়দৌড়:-

ঘোড়দৌড় ইসলামে হালাল এবং এটি সুন্নাহ থেকে উৎসাহিত। ইসলামে ঘোড়াদৌড় শুধু খেলাধুলা নয় বরং এটি মানুষের সার্বিক শারীরিক শক্তি ও সহনশীলতা বৃদ্ধি করে, মানুষকে যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত করে আর এর মাধ্যমে মানুষ দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও কৌশলগত দক্ষতা অর্জন করে। হাদিসে এসেছে যে নবী (সাঃ) ঘোড়দৌড়ে উৎসাহিত করেছেন।সাহাবারা নবী (সাঃ) এর নির্দেশে ঘোড়া চড়ার এবং যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য ঘোড়াদৌড় করত। আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত:"যে ব্যক্তি ঘোড়দৌড় শেখে এবং অনুশীলন করে, আল্লাহ তা ভালভাবে গ্রহণ করেন।" (সুনান আবু দাউদ, ২৫৭৫)

**হালাল হওয়ার শর্ত:-**

- জুয়া বা বাজি না থাকা।
- অশ্লীলতা বা সীমা লঙঘন না থাকা।
- পুরুষ-নারী একত্রে অংশগ্রহণ করা, যা নারীদের পর্দার খেলাপ।
- শরীরের জন্য ক্ষতিকর না হওয়া

জায়েয ধরণের বাজি হল, যে পুরষ্কার ঘোষণা হবে তা প্রতিযোগীদের বাদে অন্য কারো থেকে হতে হবে, অথবা কোনো এক প্রতিযোগী থেকে হতে হবে। যদি প্রতিযোগীর উভয় পক্ষ থেকে পুরষ্কার ঘোষণা হয়, যদি বলা হয় যে জয়ী হবে, সে পুরস্কার পাবে। তাহলে এটি জুয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর তা তখন হারাম হয়ে যাবে।

## সাঁতার শেখা:-

হাদীসে সরাসরি না থাকলেও সাহাবাদের আমল থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সাঁতার শেখা উৎসাহিত।

## কুস্তি:-

কুস্তি শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য উন্নয়নের জন্য ইসলাম অনুমোদন করেছে। এটি সুন্নাহ, বিশেষত যদি শরীরকে শক্তিশালী করা ও আত্মরক্ষা শেখা উদ্দেশ্য হয়।হাদিসে এসেছে নবী (সাঃ) কুস্তিগীর রুকানার সাথে কুস্তি করেছেন। হযরত আলী (রা:) থেকে বর্ণিত, "নবী (সাঃ) কুস্তি খেলতেন এবং সাহাবারা ও যুবকদেরও উৎসাহ দিতেন।"
(সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

কুস্তি খেলাও শর্ত অনুসারে হালাল:

- আদর্শ উদ্দীপনা, খেলাধুলার উদ্দেশ্য স্বাস্থ্য, ফিটনেস, আত্মরক্ষা।
- অশ্লীলতা, বাজে ভাষা বা অন্যকে অপমান করা না থাকা।
- জুয়া বা বাজি না থাকা।
- আত্মরক্ষা বা শারীরিক ক্ষতি রোধ করা।

## পাশা খেলা,লুডু খেলা, জুয়া খেলা,লটারী:-

ইসলামে পাশা খেলা (Dice/Game of chance), লুডু, লটারী বা অন্য কোনো জুয়া ভিত্তিক খেলা, ইসলাম অনুযায়ী হারাম।কারণ-

(১) জুয়া এবং সৌভাগ্যের উপর নির্ভর: পাশা খেলা মূলত জুয়া বা ভাগ্যের উপর নির্ভর করে, যা ইসলামে নিষিদ্ধ।

(২) আর্থিক ক্ষতি এবং ন্যায়হীনতা: এই ধরনের খেলা মানুষকে অর্থ, সময় এবং মনোযোগ হারাতে পারে।

(৩) হাদিসে সতর্কতা: নবী (সাঃ) বলেছেন যে জুয়া খাওয়া, খাওয়ানো এবং অংশ নেওয়া সবই নিষিদ্ধ।

"যে ব্যক্তি পাশা বা লুডু খেলে, তার হাত সুরের মাংশ ও রক্তে ডুবিয়েছে।"-(সহীহ মুসলিম :২২৬০)

এ হাদীস থেকে প্রমাণিত, পাশা ও লুডু খেলা দুটোই হারাম চাই তাতে জুয়া থাকুক বা না থাকুক।

## দাবা খেলা :-

অনেক ফকীহবিদের মতে, দাবা খেলা হারাম। কিন্তু এ সম্পর্কে ইসলামে মূলত হারাম হওয়ার কোনো দলীল পাওয়া যায় নি। কেননা, সাহাবায়ে কেরামদের পূর্বে দাবা আবিষ্কৃতই হয় নি।দাবা খেলা তখনই বৈধ যখন এ শর্তগুলো পূরণ করে।

- দাবা হালাল, যদি এটি জুয়া বা ক্ষতিকর উদ্দেশ্য ছাড়া খেলা হয়।
- সময় নষ্ট করা, বা খেলার সময় শারীরিক/মানসিক কুপ্রভাব হলে হারাম।
- খেলার সময় সংযত আচরণ করবে। অশ্লীলতা পরিহার করতে হবে।

**আজকের আধুনিক খেলাধুলা:-**

যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, জিম, সাইক্লিং, ভলিবল, টেবিল টেনিস— এগুলোও ইসলামে জায়েয, যদি নিচের শর্তগুলো মানা হয়।

ইসলামে খেলাধুলার শর্ত

- নামাজ নষ্ট না হয়।খেলা যেন নামাজ, ফরজ কাজ বা দ্বায়িত্ব পালনে বাধা না হয়।
- অশ্লীলতা না থাকে।
- পরিধান শালীন হতে হবে, বিশেষ করে মেয়েদের ক্ষেত্রে পর্দার শর্ত মানতে হবে।
- জুয়া–বাজি না থাকে।খেলার সাথে বেটিং, জুয়া, টাকা লাগানো হারাম।জুয়া মানুষকে নিজের কর্ম ও চেষ্টার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ভাগ্যনির্ভর ও ভিত্তিহীন আকাংক্ষার ওপর নির্ভরশীল করে তোলে। যে কর্ম ও চেষ্টাকে আল্লাহ তাআলা উপার্জনের মাধ্যম বানিয়েছেন।
- শরীর ক্ষতি না হওয়া।অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ বা শরীর নষ্ট করে এমন খেলা নিষেধ।
- পুরুষ–নারীর মিশ্রণ এড়ানো। মিক্সড জিম, মিক্সড স্পোর্টসে সতর্ক থাকতে হবে।

# মুসলমানদের সামাজিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত

**এক মুসলমানের জন্য অন্য মুসলমানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন বৈধ নয়**।এক মুসলমান অন্য মুসলমানের প্রতি কঠোর ব্যবহার করবে, তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, এ সবই ইসলামে হারাম বলা হয়েছে। ইসলাম তার সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় -

- ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ঠিক রাখা
- একে অপরের জান মাল ও মর্যাদা সংরক্ষণ রাখা।

শরীয়তের নির্দেশে যদি কারো মধ্যে কোনো ঝামেলা হয়ে থাকে, উভয় পক্ষকেই হিংসা, ক্রোধ ঝগড়া অভিমান দূর করতে সমঝোতার দিকে এগিয়ে আসা আবশ্যক। কেননা, রাসূল (সাঃ) বলেন, “কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে সে তার ভাইয়ের সঙ্গে তিন দিনের বেশি সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখবে।”

( সহীহ বুখারী:৬০৭৭,সহীহ মুসলিম :২৫৬০)

তিনি আরও বলেন, “কোনো মুসলিমের জন্য তার মুসলিম ভাইকে তিন দিনের বেশি পরিহার করে চলা বৈধ নয়। যখন তারা সাক্ষাৎ করে, একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি যে আগে সালাম দেয়।”(সহীহ মুসলিমঃ২৫৬০)

আর এ অপরাধ আরও জঘন্য হয়ে দাঁড়াবে যদি তা এমন লোকের সাথে হয় যার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন রয়েছে। অথচ আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা ইসলামে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন, “এবং আল্লাহকে ভয় করো, যার নামে তোমরা একে অপরের কাছে

দাবি করো, এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককেও (ছিন্ন করো না)। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ওপর সদা সতর্ক এবং তদারককারী।"
(সূরা নিসা, আয়াতঃ১)
রাসূল(সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন,
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।
-(সহীহ মুসলিমঃ২৫৫৬,সহীহ বুখারীঃ৫৯৮৪)
আত্মীয়তার সম্পর্কের ব্যাপারটি এমন নয় যে, এক নিকটাত্মীয় অপর নিকটাত্মীয়ের সাথে আচরণে ও সহযোগিতায় সমতা বজায় রেখে চলবে। বরং এর আবশ্যকীয় দিক হচ্ছে ঐ আত্মীয়তার সম্পর্কও বজায় রাখা যারা তাকে পরিহার করে চলে।রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন:
"আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা বলতে শুধু প্রতিদান দেওয়া বোঝায় না। বরং প্রকৃত সম্পর্ক রক্ষাকারী সে ব্যক্তি যাকে আত্মীয়তা ছিন্ন করা হলে সে তা পুনরায় জোড়া লাগায়।" (সহীহ বুখারীঃ৫৯৯১)
এ সম্পূর্ণ বক্তব্য ঐ সকল আত্মীয়ের জন্য যাদের সাথে দুনিয়াবী চাহিদায় সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়, যে ছিন্নতা আল্লাহর জন্য করা হয় না। আর যদি এই সম্পর্ক ছিন্ন ও রাগ আল্লাহর জন্য ও সত্যের পক্ষে থাকার জন্যে হয় তাহলে সেটি তো দৃঢ় ঈমানের পরিচয়। কেননা, দৃঢ় ঈমানের দাবী হল, আল্লাহর জন্যে ভালোবাসা ও তার জন্যে ঘৃণা করা। যেমনিভাবে রাসূল(সাঃ) ঐ তিনজন সাহাবীকে পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত পরিহার করেছিলেন, যারা শক্ত-সামর্থ্য হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াবী কারণে তাবুক যুদ্ধে/জিহাদে অংশগ্রহণ করেননি। এমনকি তাদের জন্য দুনিয়ার জমিনও সংকীর্ণ হয়ে গেছিল। আর যেদিন আল্লাহ তাআলা তাদের তাওবা কবুল করার ঘোষণা দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন, সেদিন পর্যন্ত কোনো সাহাবী তাদের সাথে কথা বলেননি। যখন পরস্পর সম্পর্কচ্ছেদ কোনো দুনিয়াবী কারণে হয়, তা তো বোকামী ছাড়া কিছুই নয়। কেননা, আল্লাহর কাছে দুনিয়া একদমই তুচ্ছ। হাদীসে এসেছে,
রাসূল(সাঃ) বলেন,"সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের দরজা খোলা হয়। এদিন আল্লাহ সেই প্রতিটি বান্দাকে ক্ষমা করে দেন, যে আল্লাহর সাথে শিরক করে না। তবে সেই দুই ব্যক্তিকে ছাড়া - যাদের মধ্যে শত্রুতা ও মনোমালিন্য থাকে। ফেরেশতারা বলেন: 'এই দুজনকে অপেক্ষায় রাখো যতক্ষণ না তারা মিলেমিশে যায়।' 'এই দুজনকে অপেক্ষায় রাখো যতক্ষণ না তারা মিলেমিশে যায়।' 'এই দুজনকে অপেক্ষায় রাখো যতক্ষণ না তারা মিলেমিশে যায়।' (সহীহ মুসলিমঃ৬৪৩৮)

**পরনিন্দা, কুৎসা রটানো, কারো দোষ খুঁজে বেড়ানো,কারো সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা আর পরস্পরের দুর্নাম পরিহার করাঃ-**

ইসলামে পরনিন্দা(গীবত),কুৎসা রটানো, কারো দোষ খুঁজে বেড়ানো আর পরস্পরের দুর্নাম করা সম্পূর্ণ হারাম এবং এটি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কোরআন ও হাদীসে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ আছে। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ তাআলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ! সন্দেহের অনেক কিছু পরিহার করো; নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ পাপ। একে অপরের গুপ্তকথা বা পরনিন্দা করো না। তোমাদের কেউ কি চায় যে সে তার ভাইয়ের মৃতশরীর খেয়ে নিক? তোমরা ঘৃণা করো। আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত,আয়াতঃ১২)

গীবতের পরিচয় সম্পর্কে আবু হুরাইরা(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "তোমরা জানো গীবত কী? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন: তোমার ভাইকে এমনভাবে স্মরণ করা যা সে অপছন্দ করবে। আমরা বললাম: যদি আমি এমন কিছু বলি যা আমার ভাইয়ের মধ্যে নেই, কি হবে? তিনি বললেন: যদি সেটা তার মধ্যে থাকে, তুমি তাকে গীবত করেছ; আর যদি না থাকে, তাহলে তুমি তার ওপর মিথ্যা গড়েছ।"-(সহীহ মুসলিমঃ২৫২৭)

রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন:

"পরনিন্দা থেকে দূরে থাকো, কারণ এটি ভাইদের মাংস খেয়ে ফেলার সমান।"

-(সহীহ মুসলিমঃ২৫২৮)

**কুৎসা রটানোঃ**- একজনের কাছে কোনো কিছু শুনে তা অন্য জনের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যার কারণে উভয়ের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যায় কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, "তুমি তোমার প্রভুর সিদ্ধান্তে ধৈর্য ধরো এবং তাদের মধ্যে এমন কাউকে অনুসরণ করো না, যে পাপী, কৃপণ, গুরুত্বহীন শপথকারী, পরনিন্দা ও কুৎসা রটনা করে ঘুরে বেড়ায়।"(সূরা আল-ক্বালম,আয়াতঃ১০–১১)

রাসূল (সাঃ) বলেন,

" চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

"(সহীহ মুসলিম:২৫৫৬,সহীহ বুখারী: ৬৪৯১)

অর্থাৎ চোগলখোর হল সেই ব্যক্তি যে গীবত, পরনিন্দা, কুৎসা ছড়িয়ে মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে।এই ধরণের লোকেরা যা শুনেছে তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা বরং নিজেদের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত এমন কিছু বলে বেড়ায় যা সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। আর যদি মন্দ কিছু না ও শুনে তবুও নিজেদের থেকে বানিয়ে বানিয়ে বলে, প্রচার করে বেড়ায় আর ভালো কথাগুলো গোপন করে। যদি কোনো ব্যক্তি দুই ব্যক্তির মধ্যে মীমাংসা করার নিয়তে মন্দ কথাগুলো গোপন রেখে একে অপরের সম্পর্কে বলা ভালো কথা শুনায় যদি ও ঐ ব্যক্তি বাস্তবে কোনো ভালো কথা বলেনি। এটা মীমাংসাকারীর জন্য জায়েয হবে। হাদীসে আছে, রাসূল (সাঃ)বলেছেন:"যে ব্যক্তি দুইজন মুসলিমের মধ্যে মীমাংসা ঘটায় বা মানুষদের মধ্যে ভালো কথা প্রচার করে সে মিথ্যাবাদী নয়, বরং সে আল্লাহর নিকট প্রিয়।"এখানে "ভালো কথা প্রচার" বলতে গীবত বা মিথ্যা নয়, বরং সত্য ও শান্তিপূর্ণ সমাধানমূলক কথা বোঝানো হয়েছে। (সহীহ মুসলিম: ২৫৬০)

রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন: "আল্লাহর দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হলো যে ব্যক্তি পারস্পরিক বিরোধ মিটিয়ে দেয়।"(সহীহ বুখারী: ৬৪৯০)

কাউকে মন্দ নামে ডাকা মানে হলো, কাউকে এমন নামে ডাকা যা সে অপছন্দ করে।আর এটি করা একদমই উচিত নয় যা ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করে।

**খারাপ ধারণা থেকে বিরত থাকা:-**

ইসলাম মানুষকে অতিরিক্ত ধারণা করা থেকে বিরত থাকতে বলেছে। কেননা, কোনো মুসলমানের জন্য এটা বৈধ নয় যে সে তার অপর ভাই সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে অযথাই সন্দেহ থেকে কোনো প্রমাণ ব্যতীত। মানুষ সৃষ্টিগতভাবে দূর্বল। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে এরকম হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এই ধারণার কাছে সে নতি স্বীকার করবে না। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন,"হে ঈমানদারগণ!তোমরা সন্দেহের অনেক কিছু পরিহার করো; নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ পাপ।"-(সূরা হুজুরাত, আয়াতঃ১২)

**কারো দোষ ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো:-**

কারো সম্পর্কে কুধারণা করা ইসলামে যেভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, সেভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারো দোষ খুঁজে বেড়ানোকে। কেননা, কুধারণার কারণেই অধিকাংশ সময়ে দোষ খুঁজে বেড়ানোর অভ্যাস তৈরী হয়। দোষ ত্রুটি অন্বেষণকারীকে রাসূল(সাঃ) মুনাফিকদের স্বভাবের সাথে তুলনা করেছেন। রাসূল (সাঃ) এ সম্পর্কে বলেন, "যে সকল লোক মুখে ঈমান এনেছে, কিন্তু অন্তরে তা পৌঁছাতে পারেনি , তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিও না এবং তাদের দোষ অন্বেষণে তাদের পিছু লেগো না।কারণ যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইয়ের দোষ খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ তাআলা তার দোষ খুঁজে বেড়ান। আর আল্লাহ যার দোষ খুঁজে বের করবেন, তাকে লাঞ্চিত করেই ছাড়বেন। যদিও সে তার ঘরের কোণে বসে থাকে।"(সুনান তিরমিজী: ২০৩২,সুনান আবূ দাউদ: ৪৮৮০)

**মানুষের মান মর্যাদা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কারো মজলিশে অনুমতি ব্যতীত আসাকে রাসূল (সাঃ) কঠোর ভাষায় নিষিদ্ধ করেছেন। অনুমতি ব্যতীত** যদি কেউ কারো বাসায় আসে,এরপর বাড়িওয়ালার পক্ষ থেকে যদি তিনি কোনো কারণে আঘাতের স্বীকার হোন তাহলে এর কোনে প্রতিশোধ তিনি নিতে পারবেননা। "যারা অনুমতি ছাড়া কারো ঘরে উঁকি দেয়, তাদের জন্য (দোষ উঁকি দেয়ার জন্য) তার চোখ ফুঁটিয়ে দেওয়া বৈধ।"
(সহীহ মুসলিমঃ ২১৫৮)

এমনকি কারো অনুমতি ও সন্তুষ্টি ব্যতীত তার কথা শোনাও হারাম। যে কান পেতে কারো কথা শুনে অথচ তারা তা অপছন্দ করে, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দেয়া হবে। অন্যকারো বাড়িতে সাক্ষাৎ করতে তার বাড়িতে গেলে তাকে সালাম দেয়া ও তার থেকে অনুমতি নেয়াকে কুরআন আবশ্যক করে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

"হে ঈমানদারগণ! অন্যের ঘরে প্রবেশ করো না যতক্ষণ না অধিবাসীদের থেকে অনুমতি চাও এবং তাদেরকে সালাম দাও। এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা সতর্ক ও সাবধান থাকো। যদি ঘরে কাউকে না পেয়ে থাক, তবে অনুমতি ছাড়া সেখানে প্রবেশ করো না। আর যদি তোমাদেরকে ফিরে যেতে বলে, তাহলে তুমি ফিরে যেও। এটাই তোমাদের জন্য অধিক পবিত্র এবং আল্লাহ তোমাদের সবকিছু সম্পর্কে অবগত।"-(সূরা নিসা, আয়াত:২৭)

**ইসলামে মুসলিম ব্যক্তির মর্যাদা হানি** করা অত্যন্ত গুরুতর পাপ। এটি গীবত, পরনিন্দা, কুৎসা রটনা বা অপবাদসহ বিভিন্ন মাধ্যমে হতে পারে। কোরআন ও হাদীস উভয়ই এটিকে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করেছে।কারো মর্যাদাহানি করার সবচেয়ে জঘন্য অপরাধ হলো

পুতঃপবিত্র নারীকে ব্যভিচারের অপরাধ দেয়া।কুরআনে এ ব্যাপারে কঠোর শাস্তির হুকুম দেয়া হয়েছে।

## গীবত জায়েয হতে পারে শর্তসাপেক্ষে :-

- কোনো নির্দিষ্ট সুপ্রয়োজনেঃ-

যদি গীবত বলা হয় হয়তো কারো জন্য সতর্কতা বা উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে।
উদাহরণ: কেউ অন্যদের বিপদ বা অবৈধ কাজ করছে, তাকে সাবধান করার জন্য।কেউ বিয়ের উদ্দেশ্যে জানতে চাইলে ইত্যাদি।

- সতর্কতা বা প্রশাসনিক প্রয়োজনেঃ-

যদি কেউ ক্ষমতাবান ব্যক্তিকে জানায়, যাতে অন্যের ক্ষতি আটকানো যায়।
উদাহরণ: সমাজে অন্যায়, চুরি, জবরদস্তি বা শোষণ বন্ধ করতে সতর্কীকরণ।

- সত্যিই প্রমাণযোগ্য বিষয়

বলা বিষয়টি সত্য হতে হবে। আদালতে সাক্ষ্য দিতে গেলে, সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।
কারো অপছন্দনীয় দোষ-ত্রুটি একান্ত প্রয়োজন না হলে তার জন্য উচিত নয় গীবত করা। যখন ইশারা করার দ্বারা কারো উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে তখন নাম বলা উচিত হবে না। নিয়ত হল সবকিছুর মূল। এটি হলো সমালোচনা ও উপদেশ এর পার্থক্যকারী। মুমিনের ব্যপারে বলা হয়ে থাকে, সে নিজের হিসাব নেয়ার ব্যাপারে অত্যাচারী শাসক ও কৃপণ অংশীদার থেকেও সতর্ক।ইসলামে যে গীবত শুনে সেও এর অংশীদার। তার উচিত গীবতকৃত ভাইকে সাহায্য করা। কেননা, হাদীসে এসেছে,"যে ব্যক্তি দুনিয়ায় তার ভাই মুসলিমের ইজ্জত (সম্মান) রক্ষা করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন।"
(সহীহ মুসলিমঃ ২৫২৮)

## গীবত থেকে বেঁচে থাকার উপায়ঃ-

(১)আল্লাহর ভয় ও পরকাল স্মরণ করা।
এটি স্মরণ করলে জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ সহজ হয়।
(২)নিজের দোষ নিয়ে ব্যস্ত থাকা।
রাসূল (সাঃ) বলেছেন:
"ধ্বংস তাদের জন্য, যারা নিজেদের দোষ ভুলে গিয়ে মানুষের দোষ খুঁজে বেড়ায়।"যে নিজের সংশোধনে ব্যস্ত থাকে, সে অন্যের দোষ নিয়ে কথা বলার সময় পায় না।
(৩) খারাপ পরিবেশ এড়িয়ে চলা।
যেখানে গীবত হয়, আড্ডা, গ্রুপ আলোচনা, অফিস/বাড়ির কথাবার্তা, এগুলোতে অংশ না নেওয়া বা বিষয় পরিবর্তন করা।
(৪)গীবত শুরু হলে সাথে সাথে থামিয়ে দেওয়া
বলা যায়-"চল অন্য কিছু কথা বলি।"
"কারো অনুপস্থিতিতে খারাপ বলা ঠিক নয়।"
এইভাবে কোমলভাবে আলোচনার দিক পরিবর্তন করা যায়।
(৫)আলাপের বিষয়কে ভালো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া।

যে ব্যক্তিকে নিয়ে কথা হচ্ছে তার ভালো গুণ স্মরণ করিয়ে দেওয়া।এটি গীবত থামানোর শক্ত উপায়।

(৬)নিজেকে প্রশ্ন করা -আমি কি তাকে সামনে এভাবে বলতাম?যদি উত্তর "না" হয়, বুঝতে হবে এটি গীবত হতে যাচ্ছে। এতে মানুষ নিজে থেকেই থেমে যায়।

(৭) নিজের ভুল হলে সাথে সাথে তওবা করা

গীবত হয়ে গেলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া যার গীবত করা হয়েছে তার নাম ধরে আল্লাহর কাছে দুয়া করা ফকিহদের মতে এটি দোষ কমিয়ে দেয়।

(৮)অন্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা অভ্যাস করা

এমন অভ্যাস তৈরি হলে গীবত স্বাভাবিকভাবেই কমে যায়।ইসলামে গোপনীয়তাকে আমানত বলা হয়েছে।

(৯)জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের দোয়া পড়া।রাসূল (সাঃ) প্রায়ই বলতেন:"হে আল্লাহ! আমার জিহ্বাকে সোজা রাখ।"

এটি নফসকে নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

(১০)সহীহ ইসলামী জ্ঞান অর্জন করা।

যত বেশি হাদীস ও কুরআন শেখা হবে তত বেশি গীবতের ভয় হৃদয়ে স্থায়ী হবে এবং মানুষ গীবত থেকে বাঁচতে পারবে।

# ইসলামে রক্তের মর্যাদা

ইসলামে রক্তের মর্যাদা (রক্তপাত, রক্ত ঝরানো, মানুষের জীবনহানি) একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। কুরআন ও হাদীসে মানুষের জীবনকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মানব জীবনকে সম্মানিত করেছে এবং তাদের জানকে সংরক্ষণ করেছে। আর এর ওপর আক্রমণ করাকে কুফরীর পরে সবচেয়ে জঘন্য গুণাহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কুরআনে অন্যায়ভাবে হত্যাকে কঠিন অপরাধ বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:"যে কেউ অন্যায়ভাবে কোনো প্রাণ হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"(সূরা মায়িদা,আয়াতঃ ৩২)

অর্থাৎ একজন মানুষের জীবনও অত্যন্ত মূল্যবান– তার রক্ত ঝরানো সাধারণ বিষয় নয়।হত্যার পাপ শুধু হত্যাকারীর সাথে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং যে লোকই হত্যার ব্যপারে কথা বা কাজ দ্বারা অংশীদার হবে সে তার অংশীদারিত্বের পরিমাণ হিসেবে আল্লাহর ক্রোধে পতিত হবে। এমন কি হত্যার সময় যে লোক ঐ স্থানে উপস্থিত থাকবে সেও পাপের ভাগিদার হবে। রাসূল (সাঃ) বলেন:"মু'মিনের হত্যা আল্লাহর কাছে দুনিয়া ধ্বংস হওয়ার চেয়েও অধিক গুরুতর।" (সহীহ আন-নাসাঈঃ৩৯৯০)

অর্থাৎ কারো রক্ত নষ্ট করা আল্লাহর কাছে এতটাই নাজুক বিষয়। ক্বিয়ামতের দিনে প্রথম বিচার হবে রক্তপাতের বিষয়ে। হাদীসে এসেছে:"কিয়ামতের দিনে প্রথম যে মামলাটি বিচার হবে তা হলো রক্তপাতের মামলা।" (সহীহ বুখারীঃ ৬৫৩৩)

আর হত্যার অপরাধ আরো জঘন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে যখন হত্যাকৃত ব্যক্তিটি মুমিন ব্যক্তি হয়ে থাকে। আর ও বলেন, “যে ব্যক্তি কোনো মুমিনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে। তার প্রতিফল হলো জাহান্নাম, যেখানে সে চিরস্থায়ী হবে; আল্লাহ তার উপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে অভিশাপ করবেন এবং তার জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রাখবেন।”
(সূরা নিসা,আয়াতঃ৯৩)
এমনকি রক্তের মর্যাদা কেবল মুসলিম নয়– সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।ইসলামে অমুসলিমের রক্তও অন্যায়ভাবে ঝরানো হারাম।রাসূল (সাঃ) বলেছেন:
“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম কে হত্যা করল, জান্নাতের সুবাসও পাবে না।”
(সহীহ বুখারীঃ৩১৬৬)
মোদ্দা কথা, যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় রক্তপাত জায়েয নয়। এমনকি যতক্ষণ না অমুসলিমরা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত অমুসলিমকের রক্ত ঝরানো হারাম। যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে তা হালাল হয়ে যায়। কিন্তু যখন তারা জিম্মি হয়ে যাবে বা চুক্তিবদ্ধ হবে, তাদের রক্ত সংরক্ষিত। তাদের সাথে সীমালঙ্ঘন করা মুসলমানদের জন্য বৈধ নয়। রাসূল (সাঃ) বলেন,
“যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ (মুআহিদ) মানুষকে হত্যা করবে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না; যদিও এর ঘ্রাণ এমন এক দূরত্ব থেকে পাওয়া যায়, যা চল্লিশ বছরের যাত্রার সমান।”
-(সহীহ বুখারীঃ৬৯১৪)

**যখন হত্যা বৈধঃ-**

(১)অন্যায়ভাবে কেউ কাউকে হত্যা করলে, তার জন্য কিসাস জায়েয হয়ে যায়। কিসাস হচ্ছে, অন্যের ওপর যতটুকু অত্যাচার করবে ততটুকু শাস্তি প্রদান করা।
(২)প্রকাশ্যে যিনা করলে। তবে শর্ত হলো, যিনাকারী বিবাহিত হবে। সাক্ষী চারজন থাকতে হবে। আর চারবার সে নিজেই বিচারকের সামনে যিনার কথা স্বীকার করতে হবে।
(৩) ইসলাম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করলে (মুরতাদ হয়ে গেলে)।
হাদীসে রাসূল (সাঃ) বলেন,
“কোনো মুসলিমের রক্ত ঝরানো বৈধ নয়, তবে তিন ধরনের লোকের ক্ষেত্রে বিবাহিত অবস্থায় ব্যভিচারকারী, প্রাণের বদলে প্রাণ (কিসাস), যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে পরে ইসলাম ত্যাগ করেছে (মুরতাদ)।(সহীহ বুখারী ৬৮৭৮, সহীহ মুসলিম ১৬৭৬)
এ তিন কারণে হত্যা করা বৈধ, তবে তা শুধু দেশের প্রশাসনের জন্য। ব্যক্তিগতভাবে কারো জন্যে তা বৈধ নয়। কেননা, এতে শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট হয়।

# আত্মহত্যা

আত্মহত্যা করাও অন্যকে হত্যা করার মতো একটি অপরাধ। সুতরাং যে ব্যক্তি যে কোনো পদ্ধতিতে নিজেকে হত্যা করল সে এমন এক আত্মাকে হত্যা করল যাকে হত্যা করা আল্লাহ তাআলা হারাম করেছেন। মানুষের জীবন তার মালিকানায় নয়। সে তা সৃষ্টি করেনি। তার জীবন তো তার কাছে রাখা আল্লাহ তাআলার আমানত। সুতরাং এর ওপর কোনো বাড়াবাড়ি বৈধ নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমতবান।"-(সূরা নিসা, আয়াতঃ ২৯)।
ইসলাম চায়,মুসলমান প্রতিটি কঠিন কাজ দৃঢ়তার সাথে সাথে মোকাবিলা করবে। বিপদ দেখে কিংবা ব্যর্থ হয়ে বা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেলে জীবন থেকে পালাতে চেষ্টা করা ইসলাম কখনও সমর্থন করে না। কেননা, মুমিনদেরকে জিহাদের জন্য তৈরী করা হয়েছে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্য নয়। তার সাথে তো এমন এক অস্ত্র আছে যার কখনও ধার হারিয়ে যায় না। ঈমানের অস্ত্র খুবই মজবুত। এ সম্পর্কে চমৎকার একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায় কুরআন থেকেই। মদীনায় হিজরত করার পর মুসলিমরা যখন ইয়াহুদী, মুনাফিক এবং আরবের মুশরিকদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পীড়া ও কষ্ট পেতে লাগল, তখন কোন কোন মুসলিম নবী করীম (সাঃ)-এর কাছে অভিযোগ করল। তাই মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য এই আয়াত নাযিল হল,"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের মতো অবস্থা এখনো তোমাদের ওপর আসেনি, যারা তোমাদের আগে চলে গেছে? তাদের ওপর এসেছিল চরম কষ্ট ও দুর্দশা এবং তারা (ভূমিকম্পের মতো) প্রকম্পিত হয়েছিল। অবশেষে রাসূল এবং তাঁর সাথে ঈমানদারগণ বলেছিল, 'কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য?' জেনে রাখো, আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী।" (সূরা বাকারা: ২১৪)

সারসংক্ষেপ হল এই, বদর যুদ্ধের সাহাবীগণের এমন এক প্রেক্ষাপট তৈরী হয়েছিল যে তারা এটা বলতে বাধ্য হোন যে কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য। নবীগণ ও তাদের সাথীদের এ অশান্ত প্রার্থনা , 'আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে' তা কোন সন্দেহের বশে নয়। বরং এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল এই যে, যদিও আল্লাহ্ তাআলা সাহায্যের ওয়াদা করেছেন, এর সময় ও স্থান নির্ধারণ করেননি। এ অশান্ত অবস্থায় এ ধরনের প্রার্থনার অর্থ ছিল এই যে, সাহায্য তাড়াতাড়ি আসুক। এমন প্রার্থনা আল্লাহর প্রতি ভরসা ও শানে নবুওয়াতের খেলাফ নয়। বরং আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বান্দাদের সবিনয় প্রার্থনাকে পছন্দ করেন। সেই বদর যুদ্ধের সাহাবীগণ, যারা মাত্র ৩১৩ জন সাহাবী মিলে ১০০০ জনের কুরাইশ বাহিনীকে পরাজিত করেন আল্লাহ তাআলার সাহায্যেই। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও তারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন । তাদের ও একটা সময় এসে বলতে হয়েছে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? মোদ্দা কথা, যখন কেউ দুঃখ -দুর্দশায় পতিত হয়, সে হতাশ হতে থাকে তার মানে এই নয় যে সে ঈমানদার নন । তার ঈমান মজবুত নয়। এতে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। অনেকে বলেন, তুমি হতাশ হচ্ছো, কান্না করছো, তার মানে তোমার ঈমান দূর্বল, আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেন না। বিষয়টি পুরো উল্টো। একজন ব্যক্তি যখন কুরআন পড়তে থাকেন, তখন তিনি বুঝতে পারেন, প্রত্যেক নবী রাসূল তার জীবনে কত পরীক্ষা দিয়ে গেছেন। যদি সত্যিই পরীক্ষায়

আপতিত হওয়া মানে আল্লাহ তোমাকে পছন্দ করেন না তাহলে, নবী রাসূলকে আল্লাহ পছন্দ করতেন না? নাউজুবিল্লাহ । কেননা, তাদের জীবনের পরতে পরতে পরীক্ষা আর পরীক্ষা। অথচ তারাই সবচেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি পৃথিবীতে ।

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে, তাদের ওপরও বিভিন্ন সময়ে কষ্ট, বিপদ, এবং পরীক্ষা আসবে, যেমনটি পূর্ববর্তী ঈমানদারদের ওপর এসেছিল।

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, পরিশ্রম ও মেহনত ব্যতীত এবং বিপদ-আপদে পতিত হওয়া ছাড়া কেউই জান্নাত লাভ করতে পারবে না। তবে কষ্ট ও পরিশ্রমের স্তর বিভিন্ন। নিম্নস্তরের পরিশ্রম ও কষ্ট হচ্ছে স্বীয় জৈবিক কামনা-বাসনা ও শয়তানের প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করে কিংবা সত্য দ্বীনের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধাচরণ করে নিজের বিশ্বাস ও আকীদাকে ঠিক করা। এ স্তর প্রত্যেক মুমিনেরই অর্জন করতে হয়। অতঃপর মধ্যম ও উচ্চস্তরের বর্ণনা- যে পরিমাণ কষ্ট ও পরিশ্রম করতে হবে, সে স্তরেরই জান্নাত লাভ হবে। এভাবে কষ্ট ও পরিশ্রম হতে কেউই রেহাই পায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সবচাইতে অধিক বালা-মুসীবতে পতিত হয়েছেন নবী-রাসূলগণ। তারপর (মর্যাদার দিক থেকে) তাদের নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ'। (ইবনে মাজাহঃ ৪০২৩)

রাসূল (সাঃ) আরও বলেন যে, "তোমাদের পূর্বের লোকদেরকে তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত করাত দিয়ে চিরা হত এবং লোহার চিরুনী দিয়ে তাঁদের গোশত ও চামড়াকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা হত। কিন্তু এই অকথ্য যুলুম-নির্যাতন তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। অতঃপর বললেন, ''আল্লাহর শপথ! মহান আল্লাহ এই দ্বীনকে এমনভাবে জয়যুক্ত করবেন যে, একজন আরোহী (ইয়ামানের) সানআ' থেকে হাযরে-মাউত পর্যন্ত একা সফর করবে, তার মধ্যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ভয় থাকবে না।'' (সহীহ বুখারী :৩৬১২)। এ থেকে নবী করীম (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য, মুসলিমদের মধ্যে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রেরণা ও অটল থাকার দৃঢ় সংকল্প সৃষ্টি করা। এই জন্যই বলা হয়, 'যা আসবেই, তা আসন্ন'। আর ঈমানদারদের জন্য আল্লাহর সাহায্য যেহেতু সুনিশ্চিত তাই তা নিকটেই। তাই, আত্মহত্যা কোনো সমাধান নয়। ধৈর্যের সাথে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস করে আত্মহত্যার মত ঘৃণিত কাজ পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, এই জীবন যাক না দুঃখ দুর্দশায়, আখিরাত যেনো দুঃখ-দুর্দশায় না কাটে। জান্নাতই হোক আমাদের সকলের একমাত্র ঠিকানা।

# ধন সম্পদের মর্যাদা

শরীয়তের দৃষ্টিতে, বৈধ পন্থায় কোনো মুসলমান যদি সম্পদ জমা করে এবং তার থেকে লভ্যাংশ অর্জন করে তাতে কোনো গুণাহ নেই। ইসলাম বলে,
“সৎ লোকের জন্যে হালাল সম্পদ কতই না উত্তম।”

- **ব্যক্তিগত সম্পদের অপব্যবহার:-**

ইসলামে ব্যক্তিগত সম্পদের অপব্যবহার বা সম্পদের অনৈতিক ব্যবহারকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সম্পদ আল্লাহর দেয়া একটি আমানত, যার সঠিক ব্যবহার ব্যক্তির ঈমান ও নেকির পরিমাপ করে।কেননা, মানুষের ধন-সম্পদ নিজস্ব নয়, এটি আল্লাহর দেওয়া আমানত।একজন মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, “আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন উচ্ছৃঙ্খল বা অতিরিক্ত ব্যয় করে না, আবার কৃপণতাও করে না; বরং তারা উভয়ের মধ্যে সমতুল্য বা মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।”-
(সূরা ফোরকান, আয়াতঃ৬৭)
হালাল ধন উপার্জনের পরও যদি তা অন্যায়, জুলুম বা নিজের ইচ্ছামতো অপব্যবহার হয়, তবে তা হারাম। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন,
“তোমরা সম্পদ বৃথা-অপচয় করবে না, যা অজান্তে বা অহংকারে নষ্ট হবে।”(সূরা ইসরা,আয়াতঃ২৬–২৭)
হাদীসে রাসূল (সাঃ)বলেছেন—
“যে ব্যক্তি সম্পদকে হালাল উপার্জনের পর অন্যায়ভাবে ব্যয় করে, আল্লাহ তার উপর রাগ করবেন।” (সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম)
সঠিক ব্যবহার:-
(১) নিজের ও পরিবারের জন্য প্রয়োজনমতো ব্যয়
(২)দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য (যাকাত, সাদাকা)
(৩)সমাজকল্যাণে বিনিয়োগ।
(৪)জুলুম বা অন্যায় কাজে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা।

- **ঘুষ হারাম :-**

মানুষের সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাতের একটি পদ্ধতি হল ঘুষ খাওয়া। ইসলামে ঘুষ পরিষ্কারভাবে হারাম এবং একটি কবীরা গুনাহ। ঘুষ দেয়া,ঘুষ নেয়া,ঘুষের মাধ্যমে কারো হক মেরে নেয়া সবই হারাম।রাসূল (সাঃ) বলেছেন “ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহনকারী উভয়েই জাহান্নামী।” (সুনান তিরমিযী)
“ঘুষদানকারী, ঘুষগ্রহণকারী এবং এদের মধ্যস্থকারী—তিনজনই অভিশপ্ত।”
(মুসনাদ আহমাদ)

**ঘুষ হারাম ঘোষণা করার কারণঃ-**
এটি মানুষের হক নষ্ট করে
সমাজে দুর্নীতি ছড়ায়
ফেতনা-ফ্যাসাদ, জুলুম ও অন্যায় বাড়ায়
যোগ্য মানুষ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।
আল্লাহর গজবকে ডেকে আনে।

**যখন ঘুষ দেওয়া জায়েয :-**
ইসলামে শুধুমাত্র একটি অবস্থায় ঘুষ দেওয়া বৈধ হয়।যখন কারো হক আদায় করতে জালিমের হাত থেকে বাঁচার জন্য ঘুষ দিতে হয়।যেমন—
নিজের বৈধ কাজ আদায় করতে কর্মকর্তা ঘুষ না দিলে কাজ করবে না। হজ্জ্ব, ওয়ারিশ, জমির কাগজ এসব বৈধ কাজ জোর করে আটকে রাখলে
,জীবন-মান-ইজ্জত বাঁচাতে বাধ্য হওয়া। এ ক্ষেত্রে পাপ হবে ঘুষ গ্রহণকারীর, নয় ঘুষ দিতে বাধ্য হওয়া ব্যক্তির।

# সূত্রঃ

**ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান (আল্লামা ইউসুফ আল কারজাভী)**